ইতিহাস

ইতিহাস

প্রথম ভাগ

(তৃতীয় শ্রেণীর জন্য)

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

ভূমিকা

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমগ্র পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বৎসর আগে এই ইতিহাস পুস্তক রচিত হয়েছিল। এ-বৎসর এ-পুস্তক পুনর্লিখিত হয়েছে। যাদের জন্য লেখা, তাদের পক্ষে এটি এবার আরও বেশী উপযোগী হয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

বিষয় নির্বাচন বা বর্জন, ভাষাবিন্যাস পুনর্লিখন, অলংকরণ, মুদ্রণ এবং অন্যান্য নানা বিষয়ে যাঁরা সাহায্য করেছেন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মহাকরণ : কলিকাতা-১
জানুআরি ১৯৭৫

নিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

ভূমিকা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা-মন্ত্রকের পরিকল্পনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কয়েক বৎসর আগে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অপেক্ষাকৃত স্বল্পমূল্যে সেই সব পাঠ্যপুস্তক পরিবেশনও ছিল পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

এই পরিকল্পনার পরিপূরক হিসাবে ১৯৭০ সনের জানুআরি মাস থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা বই বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া শুরু হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের উদ্দেশ্যে স্থির হয়েছে যে, ১৯৭৫ সনের জানুআরী মাস থেকে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য সরকার-প্রকাশিত সমস্ত প্রকারের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দেওয়া হবে।

আশা করি, পশ্চিমবঙ্গের অগণিত ছাত্রছাত্রী এই পরিকল্পনার দ্বারা উপকৃত হবেন ও এই ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে বিশেষভাবে সহায়ক হবে।

মহাকরণ
জানুআরি ১৯৭৫

নিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রথম যুগ

যে দেশে আমাদের জন্ম, যেখানকার জল-মাটি-ফল-তৃণ-তরু-হাওয়ায় আমরা লালিতপালিত হয়েছি—সে দেশ আমাদের মায়ের মতো। তাই জন্মভূমির আর এক নাম 'মাতৃভূমি'। কোনো কোনো জাতি দেশকে 'পিতৃভূমি'ও বলেন। তাঁদের কাছে দেশ পিতার মতো। সকল দেশ ও সকল জাতির কাছেই জন্মভূমি অত্যন্ত প্রিয়। সংস্কৃতে একটি শ্লোক আছে—"মা এবং জন্মভূমি স্বর্গের থেকেও বড়ো।"

এই প্রিয় জন্মভূমিকে জানতে হলে তার ইতিহাস ভূগোল তার প্রাকৃতিক সম্পদ তার সাহিত্য এবং তার অতীত গৌরবের কাহিনীও জানতে হয়।

কোনো একটি দেশের মানুষের কাহিনী নিয়ে সেখানকার ইতিহাস রচিত হয়। মায়ের কোলে জন্মগ্রহণ করে শিশু যেমন আস্তে আস্তে বড়ো হয়, তেমনি মানুষ জন্মভূমির

কোলে জন্মগ্রহণ করে জন্মভূমির কাছেই নূতন নূতন জিনিসের সন্ধান পায়, নূতন নূতন আবিষ্কার করে, ক্রমে ক্রমে উন্নত হতে থাকে। জন্মভূমিকে অন্যের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে গিয়ে তারা প্রাণ দেয়। জন্মভূমিকে সুন্দর করার জন্য তারা কঠোর পরিশ্রম করে। নিজেদের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করার জন্য তারা নানা নিয়মকানুন তৈরি করে। সে নিয়মকানুন পালন করার জন্য এবং রাজ্য শাসনের জন্য সমাজপতি
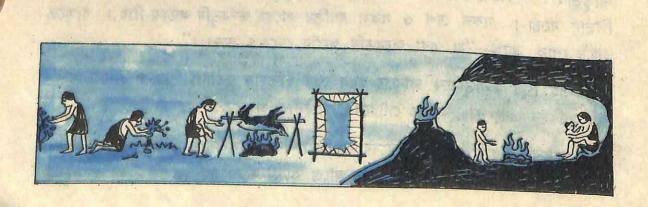
এবং রাজার পদের সৃষ্টি হয়। নানা দেশের মানুষের এই অগ্রগতির কাহিনীও ইতিহাসের উপাদান।

আমাদের দেশ ভারতবর্ষের ইতিহাস অতি গৌরবের। যে কয়টি দেশকে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের কাছে আদর্শস্থানীয় বলে মনে করা হয়, ভারতবর্ষ তাদের মধ্যে একটি। আমাদের ইতিহাসও অতি প্রাচীন। কিন্তু প্রাচীন কালে ইতিহাস লিখে রাখার নিয়ম ছিল না বলে, আমাদের অনেক গৌরবের কাহিনী হারিয়ে গিয়েছে। কোনো কোনো কাহিনী নানা প্রমাণ ঘেঁটে ঘেঁটে এখনও উদ্ধার করা চলছে। কিন্তু সোজাসুজি ইতিহাস লেখা না হলেও, আমাদের সাহিত্য বা শিল্পের মধ্যে ইতিহাসের নানা উপাদান ছড়িয়ে আছে।

পশুদের থেকে আলাদা হয়ে কবে প্রথম ভারতবর্ষের মানুষ সভ্যমানুষ হয়েছিল, সে কথা নিশ্চিত করে এখনও বলা যায় না। তবে নানা জায়গা থেকে মাটির তলায় মানুষের যে-সব কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে, তার থেকে একথা বোঝা যায় যে পৃথিবীর অন্য কোনো কোনো অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের মানুষ একদিন দুপায়ে দাঁড়িয়ে তার হাত দুটিকে অন্য কাজের জন্য লাগাতে শিখল। সেদিন থেকেই মানুষের জয়যাত্রা আরম্ভ হল।

মাটির তলা থেকে আদিম মানুষের পাথরের অস্ত্র-শস্ত্র ভারতবর্ষেও অনেক পাওয়া গিয়েছে। তার আগের যুগে নিশ্চয়ই ডালপালার অস্ত্র ছিল, কিন্তু সেগুলির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। ক্রমে মানুষ আগুনের ব্যবহার এবং কৃষিবিদ্যা শিখল। কোনো কোনো পশুকে, যেমন কুকুর গোরু ইত্যাদিকে পোষ মানাল; ধাতু এবং মাটির থেকে নানা জিনিস বানাতে শিখল। আগে তারা দল বেঁধে পাহাড়ের গুহায় থাকত। ধীরে ধীরে অন্য যায়গায় বাড়ি বানাতে শিখল। মা, বাবা এবং প্রতিবেশী বৃদ্ধ এবং শিশুদের পালন করতে শিখল। অবসর সময়ে তারা গান করত বা ছবি আঁকত। ক্রমে তারা সাহিত্য এবং শিল্প রচনা করতে শিখল। মানুষ যেদিন চাকা বানানো শিখল সেদিন থেকে যন্ত্রবিজ্ঞান তার কাছে ধরা দিল। যেটুকু দেখতে পাচ্ছিল তার বাইরের পৃথিবীকে জানবার আগ্রহও তাকে নানা আবিষ্কারের দিকে টেনে নিয়ে গেল।

পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূর আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকেও চিনতে চাইল, সুরু হল জ্যোতির্বিজ্ঞানের। এই জীবনের পর জীবন আছে কিনা সে চিন্তা থেকে দর্শনের সূত্রপাত হল। এরকম করেই মানুষ পৃথিবীর বাইরে এবং জীবনের পরপারের রহস্য সন্ধান করতে শিখল।

অন্যান্য প্রাচীন সভ্যদেশেও যেমন, ভারতবর্ষেও তেমনি সভ্যতার বিকাশ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আলাদা করেই আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু এক অঞ্চলের সভ্য মানুষের সঙ্গে যখন অন্য অঞ্চলের সভ্যমানুষের দেখা হত, তখন একে অন্যের সঙ্গে শুধু যুদ্ধই করত না, অন্যের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা থেকে তারা নূতন জিনিসও গ্রহণ করত। আমাদের বর্তমান ভারতবর্ষের সভ্যতায় বহু দেশ এবং জাতির থেকে নেওয়া নানা উপাদান মিশে আছে।

ভারতবর্ষও পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে অনেক নূতন জিনিস দিয়েছে। তার মধ্যে কাব্য, দর্শন তো আছেই, অনেক ব্যবহারিক জিনিসও আছে। এক থেকে

নয় এবং শূন্য দিয়ে সমস্ত সংখ্যাকে লেখার পদ্ধতি ভারতবর্ষেই আবিষ্কৃত হয়। এর নাম দশমিক পদ্ধতি। জ্যোতির্বিজ্ঞান রসায়ন এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের বহু তথ্য ভারতবর্ষ পৃথিবীকে দিয়েছে।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

এ পর্যন্ত ভারতবর্ষে সভ্য মানুষদের বসতির প্রথম যে পরিচয় পণ্ডিতেরা খুঁজে বের করেছেন, সেগুলি ছিল সিন্ধুনদের তীরে মহেঞ্জোদারো এবং হরপ্পা বলে দুটি জায়গাকে ঘিরে। এজন্য এই সভ্যতার নিদর্শনকে সিন্ধুসভ্যতার নিদর্শন বলা হয়েছে। এ স্থানগুলি এখন ভারতের পশ্চিমে পাকিস্তানে। আমাদের গৌরবের বিষয় যে মহেঞ্জোদারো আবিষ্কার করেছিলেন একজন বাঙালি। তাঁর নাম রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিন্ধু সভ্যতার কালে আনুমানিক খ্রিস্ট-পূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ বছরের মধ্যে

হরপ্পায় প্রাপ্ত সিল মোহর

মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার
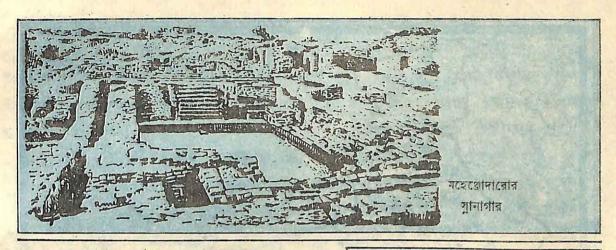
ভারতবর্ষের মানুষ নগর পত্তন করেছিল। তারা যুদ্ধ করত, কৃষিকাজ জানত, পশুপালন করত এবং নানা প্রকার দেবদেবী এবং মানুষের মূর্তি গড়ত। শহরের রাস্তা এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা স্নানাগার ইত্যাদি দেখে আজকের লোকেরাও বিস্মিত হয়।

মনে হয়, এর পর যারা ভারতবর্ষে প্রবল হয়ে উঠল তারা এই সিন্ধু সভ্যতার লোকদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। এই নূতন মানুষেরা ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করতে পারত বলে তাদের ঠেকানো খুব মুশকিল হয়েছিল। তবে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শনগুলি দক্ষিণ ভারতে আরও বহুদিন পরও বর্তমান ছিল। এমন কি বাঙলা দেশের বর্ধমান জেলায় পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পাওয়া কতগুলি প্রমাণ থেকে মনে হয় মহেঞ্জোদারোর কাছাকাছি সময়ের সভ্যমানুষ ওই অঞ্চলেও বাস করত।

মহেঞ্জোদারো সভ্যতার পর যে মানুষেরা ভারতবর্ষে নিজেদের অধিকার বিস্তৃত করল

হরপ্পার মাটির নীচে অবস্থিত নগরী
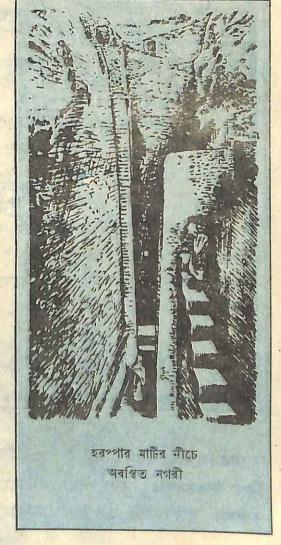
তাদের সাধারণ নাম আর্য। আর্যরা সম্ভবত ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের পূর্বের সভ্য জাতিদের সঙ্গে মিলেমিশে তাঁরা নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করলেন, তার নামই ভারতীয় সভ্যতা বা হিন্দু-সভ্যতা।

যে সময় থেকে ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে মোটামুটি ভালোভাবে জানা যায়, সে-সময়টাকে বলে বৈদিক যুগ বা বেদের যুগ। বেদের যুগ এখন থেকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে আরম্ভ হয়েছিল বলে মনে হয়। এই সময় ঋক্‌বেদ বলে ধর্ম-গ্রন্থটি রচিত হয়। প্রথমে এটি ঋষিদের মুখে মুখেই ছিল, লেখা হয়নি। শুনে শুনে শিখতে হত বলে তাকে বলা হয় "শ্রুতি"। ঋক্‌বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। এর মধ্যে ইতিহাসের অনেক উপাদান আছে। তাছাড়া কাব্য হিসেবেও এটি খুব উঁচু দরের। ঋক্‌বেদ ছাড়াও পরবর্তী কালে আরও কয়েকটি বেদ রচিত হয়। বেদের পরের যুগে রচিত হয় উপনিষদ্। উপনিষদ্‌গুলি ভারতবর্ষে তো বটেই, ভারতবর্ষের বাইরের অনেক দেশে দর্শনচিন্তার সূত্রপাত করে। উপনিষদের পর পুরাণ বলে এক রকম কাব্য রচিত হয়েছিল। সেজন্য এ যুগকে পৌরাণিক যুগ বলে। পৌরাণিক যুগে আমাদের সবচেয়ে বড় দুটি গৌরবময় গ্রন্থ হল মহাভারত এবং রামায়ণ। এ দুটি গ্রন্থের কাহিনী তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। রামায়ণ এবং মহাভারতের গল্পের মধ্যে সে-যুগের অনেক খবর পাওয়া যায়।

সে কালের ভারতবর্ষের সভ্যতা বা হিন্দু-সভ্যতা কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকল না। ক্রমে ক্রমে শক, হূন, পাঠান, মোগল প্রভৃতি নানা জাতি এদেশে এসেছে। তাদের সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম—বিশেষ করে মুসলমান ও খ্রিস্টধর্মও এদেশে এল। বাইরের জাতিরা প্রায় সকলেই এসেছিল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে। কিন্তু উত্তর বা উত্তর-পূর্বে অন্যান্য পার্বত্য জাতির সঙ্গেও ভারতবর্ষের মানুষের যোগাযোগ হয়েছে। এই সকল জাতি ও ধর্মের লোকেদের আচার-ব্যবহার, ধর্মমত ভারতবর্ষের লোকেরা অনেক পরিমাণে গ্রহণ করে ধীরে ধীরে যে নূতন সভ্যতা গড়ে তুলেছে, তাকেই আমরা বলি ভারতীয় সভ্যতা। নানা সভ্যতার এই মিলনের কাহিনীই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধদেব

এখন থেকে আড়াই হাজার বছরেরও কিছু আগেকার কথা। এখন যেখানে নেপালের তরাই বা জঙ্গল-ভর্তি অঞ্চল, তখন সেখানে শক নামে একটি জাতি বাস করত। তাদের রাজধানী ছিল কপিলাবস্তু। শকদের বংশকে বলত শাক্য বংশ। শাক্য বংশের রাজা শুদ্ধোদন। কোনো সন্তান ছিল না বলে শুদ্ধোদনের বড় দুঃখ ছিল।

অনেকদিন পর রানী মায়াদেবী যখন পিত্রালয়ে যাচ্ছেন, তখন রাজপুরীর কাছে লুম্বিনী নামে একটি বাগানে মায়াদেবীর কোল আলো করে একটি শিশুর জন্ম হল। জন্মের সময়টা ছিল এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি। এই শিশুই পরে মহামানব বুদ্ধ রূপে পরিচিত হলেন। শিশুর নাম দেওয়া হল সিদ্ধার্থ।

কথিত আছে, সিদ্ধার্থের জন্মের আগে মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একটি সুন্দর শ্বেতহস্তী এসে তাঁর দেহে মিলিয়ে গিয়েছিল। এটাকে গণকরা শুভ লক্ষণ মনে করেছিলেন।

সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিনের মধ্যেই মায়াদেবীর মৃত্যু হল। সিদ্ধার্থের এক মাসি ছিলেন শুদ্ধোদনের ছোটোরানী। তাঁর নাম গৌতমী। তিনিই শিশুটিকে পালন করার ভার নিলেন।

ছোটোবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ ছিলেন একটু আনমনা। তিনি সর্বদাই কি যে ভাবতেন কেউ জানত না। ছেলের এই ভাব লক্ষ্য করে শুদ্ধোদন খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন, হয়তো সে বাড়িঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তাই তাঁকে সব সময়ই নানা আমোদ-প্রমোদের মধ্যে রাখলেন এবং একটু বড়ো হতেই তাকে খুব সুন্দরী এক কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তার নাম গোপা। আর এক নাম যশোধরা। কিছুদিন
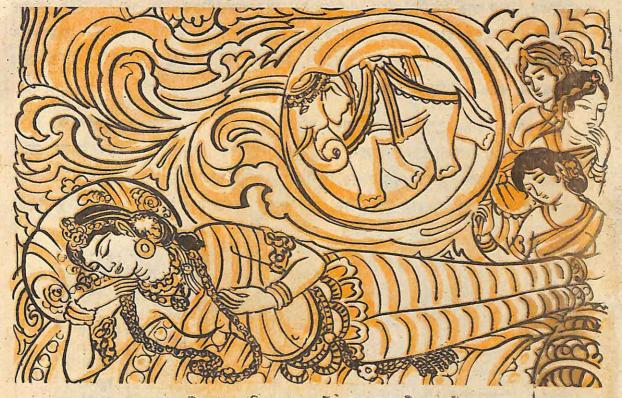
মায়াদেবী স্বপ্ন দেখেছিলেন যে একটি সুন্দর শ্বেতহস্তী এসে তাঁর দেহে মিলিয়ে গিয়েছিল

পরে সিদ্ধার্থের একটি পুত্র হল। পুত্রের নাম রাখা হল রাহুল। শুদ্ধোদন মনে মনে এই ভেবে খুশি হলেন যে, এবার সিদ্ধার্থ সংসারে বাঁধা পড়েছেন। আর সন্ন্যাসী হবার ভয় নেই।

কিন্তু আমোদ-প্রমোদে সিদ্ধার্থ পুরোপুরি বাঁধা পড়লেন না। সিদ্ধার্থর সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হবার সম্বন্ধে যে-কাহিনী পরে প্রচারিত হয়েছিল, তা এরূপ। একদিন সিদ্ধার্থ নগর ভ্রমণে বেরিয়ে একজন বৃদ্ধকে দেখলেন। তার দেহ কুঁজো, সে চোখে দেখতে পায় না। সকলকে এরকম বৃদ্ধ হতে হবে জেনে সিদ্ধার্থের মনে ব্যথা লাগল। আর একদিন নগর ভ্রমণে বেরিয়ে একজন রোগীকে দেখলেন। সে যন্ত্রণায় চিৎকার করছিল। সিদ্ধার্থ বুঝলেন রোগের হাত থেকেও মানুষের নিস্তার নেই। তার কিছুদিন পর নগরের রাস্তায় একজন মৃতকে দেখলেন। সিদ্ধার্থ বুঝতে পারলেন, মৃত্যুও মানুষের হবেই। সিদ্ধার্থ যখন বার্ধক্য, রোগ ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার কথা চিন্তা

করছিলেন, তখন আর একদিন পথে এক সৌম্য দর্শন সন্ন্যাসীকে দেখলেন। তাঁর একথা মনে হল দুঃখকষ্টের হাত থেকে উদ্ধারের উপায় সন্ন্যাসীর জানা আছে। তাঁর মনে হল তিনি পথ খুঁজে পেয়েছেন। এগুলি হয়তো গল্প, কিন্তু বুদ্ধদেবের মনের ভাব এতে সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে।

একদিন রাত্রিতে সমস্ত প্রাসাদ ঘুমিয়ে পড়েছে। শিশুপুত্র রাহুলকে বুকে নিয়ে যশোধরাও অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। সিদ্ধার্থ তাঁদের দিকে শেষবারের মতো চেয়ে দেখলেন। তারপর মনকে শক্ত করে চিরদিনের জন্য রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। রাজ্যের সীমায় এসে সিদ্ধার্থ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন। শুরু হল তাঁর একাকী

সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ

সুজাতার সিদ্ধার্থকে পায়েস দান
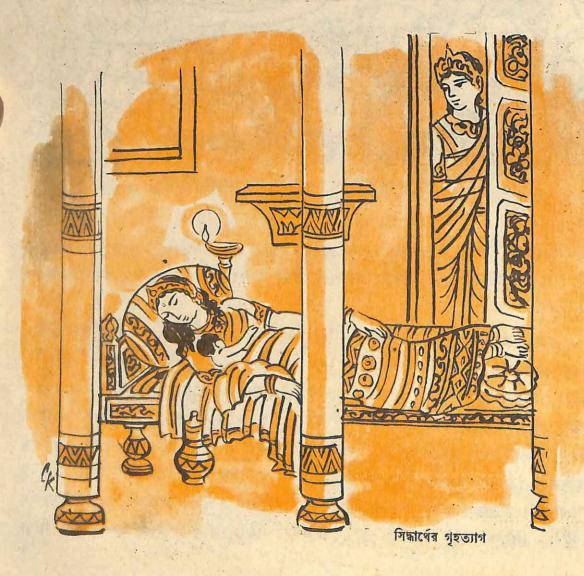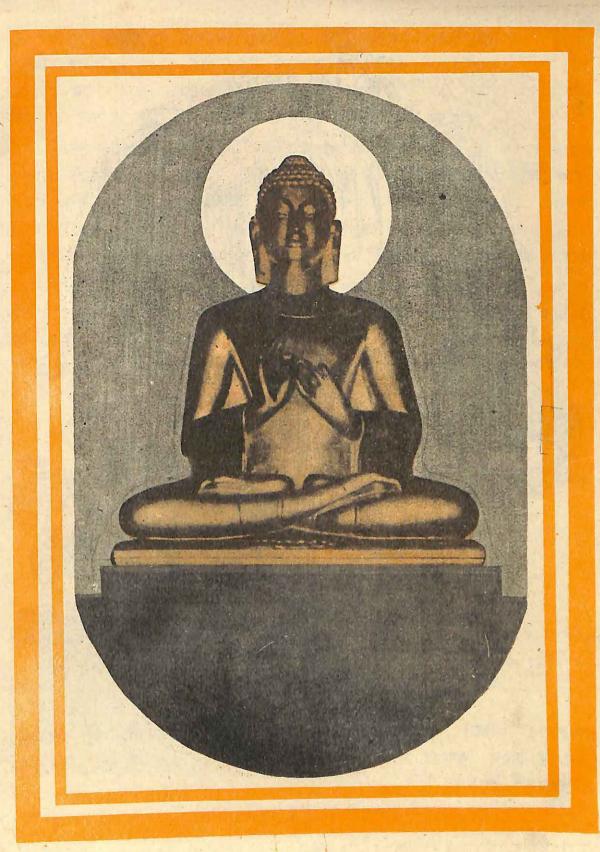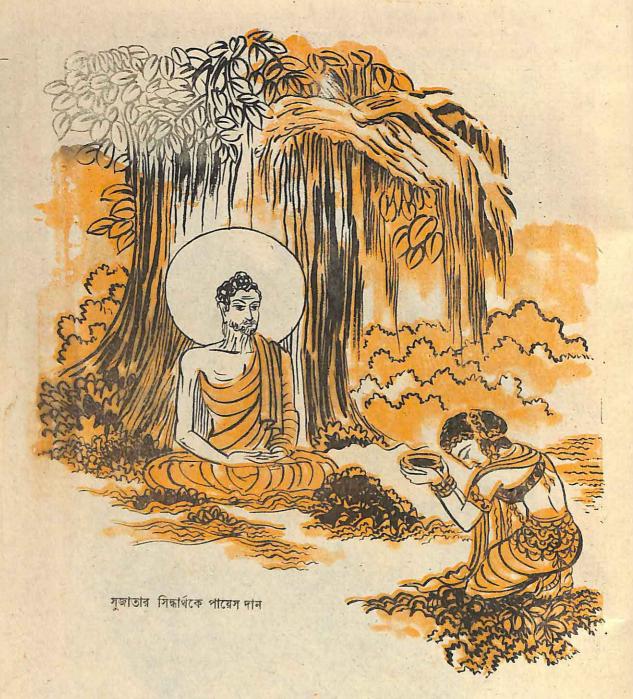
পথচলা। পিছনে পড়ে রইলেন রাজা শুদ্ধোদন, মাতা গৌতমী, পত্নী যশোধরা, শিশুপুত্র রাহুল, অসংখ্য আত্মীয়বন্ধু এবং অগণিত প্রজা। আর ধুলোর মতো পড়ে রইল অতুল ঐশ্বর্য।

তারপর আরম্ভ হল সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসী-জীবন। প্রথমে বৈশালী, তারপর রাজগৃহ (বর্তমান রাজগীর) হয়ে, গয়ার কাছে নৈরঞ্জনার তীর ধরে চলতে চলতে তিনি মস্ত বড় এক অশ্বত্থ গাছের ছায়ায় এসে থামলেন। গাছের স্নিগ্ধ ছায়া এবং নদীর তীরটি তাঁর বড় মনোরম বলে মনে হল। তপস্যার উপযুক্ত স্থান।

সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসার আগে একদিন সকালবেলা একটি মেয়ে তাঁর পায়ের কাছে একপাত্র পায়েস এনে রাখলেন। মেয়েটির নাম সুজাতা। পায়েস গ্রহণ করে সিদ্ধার্থ তৃপ্তি পেলেন। সুজাতা সিদ্ধার্থের আশীর্বাদ নিয়ে ফিরে গেলেন। সিদ্ধার্থ ধ্যানে বসলেন। তাঁর সংকল্প, যতদিন মানুষের মুক্তির পথ না পাবেন ততদিন তিনি আর উঠবেন না। দুঃখের কিসে শেষ হয়, এই পরম জ্ঞান তাঁকে লাভ করতেই হবে।

দীর্ঘকালের তপস্যা অর্থাৎ গভীর চিন্তা ও ধ্যানের পরে, তিনি অনুভব করলেন জীবকে দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে কি করে রক্ষা করা যায় সে জ্ঞান তিনি লাভ করেছেন। এই জ্ঞানকে বলা হয় 'বোধি'। 'বোধি' লাভ করেছেন বলে তাঁর নাম হল 'বুদ্ধ'। যে জায়গায় তিনি তপস্যা করেছিলেন তার নাম হল বুদ্ধগয়া'। আর যে-অশ্বত্থ
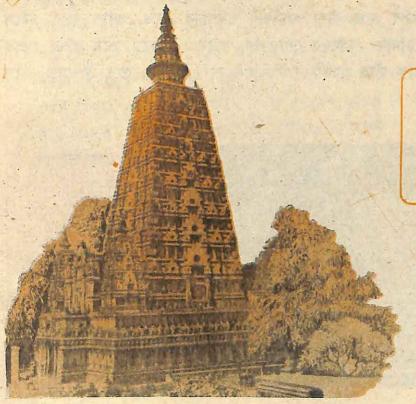
বুদ্ধগয়া

গাছটির তলায় তিনি তপস্যা করেছিলেন সেটি 'বোধিবৃক্ষ' নামে পরিচিত হল। বোধি লাভের পরে বুদ্ধ বারাণসীর নিকটে ঋষিপত্তন নামে এক জায়গায় গিয়ে প্রথম ধর্মপ্রচার করেন। এই প্রথম ধর্মপ্রচারকে বলা হয় ধর্মচক্র প্রবর্তন। যে তিথিতে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন সেটা ছিল এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা। বুদ্ধগয়া এখন সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ এবং বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবান লোকেদের তীর্থভূমি। বুদ্ধভক্তরা বৈশাখী পূর্ণিমার মতো আষাঢ়ী পূর্ণিমাকেও পবিত্র তিথি বলে মনে করেন। আর বুদ্ধগয়ার মতো ঋষিপত্তনও হয়েছে বুদ্ধভক্ত জনগণের একটি তীর্থস্থান। ঋষিপত্তনকে আজকাল বলা হয় সারনাথ।

সত্যকথা বলা, সৎকর্ম করা, সৎভাবে জীবন যাপন করা, কোনো মানুষকে বড় বা ছোটো মনে না করে সকলের সঙ্গেই সমান ব্যবহার করা, সকলকেই আপনজনের মতো ভালোবাসা—এগুলিই ছিল বুদ্ধদেবের সমস্ত উপদেশের মূল কথা। তাঁর উপদেশের সারকথা পাওয়া যায় একটি ছোটো বই-এ। বইটির নাম 'ধম্মপদ'। বুদ্ধ-ভক্তরা এই ধম্মপদকে সবচেয়ে পবিত্র বই বলে মনে করেন।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরে নানা জায়গায় ধর্মপ্রচার করে, আশি বছর বয়সে কুশিনগর নামক স্থানে মহামানব বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন। ক্রমে ক্রমে রাজা থেকে গরিব প্রজা পর্যন্ত বহু লোক তাঁর প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করল, অর্থাৎ তাঁর উপদেশ মেনে নিল।
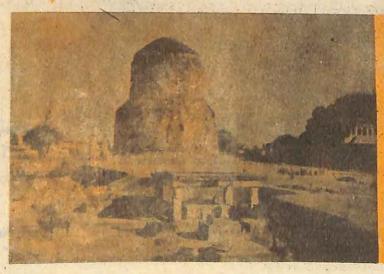
প্রাচীন সারনাথের
ধ্বংসাবশেষ

গরীব দুঃখীদের প্রতি কিংবা যাদের আমরা ছোটো জাত বলে মনে করি তাদের প্রতি বুদ্ধদেবের অশেষ দয়া ছিল। তিনি কাউকেই ছোটো বলে মনে করেননি। দরিদ্রের দুঃখ দূর করার জন্য নিজেও চেষ্টা করতেন, সকলকে উপদেশও দিতেন। কথিত আছে একবার বুদ্ধদেব বৈশালী নগরে তাঁর শিষ্যদের কিছু দিন ধরে উপদেশ দিচ্ছিলেন। যাঁরা তাঁর উপদেশ শুনতে আসতেন তার মধ্যে একটি গোপালক বা রাখাল ছিলেন। একদিন বুদ্ধদেব উপদেশ দেবার সময় দেখলেন সে-রাখালটি উপস্থিত নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তিনি তখনও আসেননি। বুদ্ধদেব বললেন, 'তাহলে আমি ওর জন্য অপেক্ষা করব।' অন্যান্য সকলে একথায় একটু ক্ষুণ্ণ হলেন। একজন রাখালের জন্য বুদ্ধদেবের উপদেশ বন্ধ থাকবে একথা তাঁরা ভাবতে পারেননি। কিছুক্ষণ পরে রাখালটি এসে উপস্থিত হলে, বুদ্ধদেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁর এত দেরি হল কেন। তাঁর জন্য উপদেশ দেওয়া বন্ধ আছে জেনে তিনি এমনিতেই লজ্জা পাচ্ছিলেন। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে তিনি জানালেন, তাঁর একটি গোরু হারিয়ে গিয়েছিল, সেটি খুঁজে পেতে দেরি হওয়াতেই তাঁর আসতেও দেরি হয়েছে। বুদ্ধদেব আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর খাওয়া হয়েছে কিনা। রাখালটি বললেন, না হয়নি। দেরি হয়ে গিয়েছে, পাছে উপদেশের অনেকটা হয়ে যায় সে ভয়ে তিনি না খেয়েই এসেছেন। বুদ্ধদেব তখন তাঁর শিষ্যদের বললেন, তোমাদের ঘরের খাবার থেকে একে কিছু এনে খেতে দাও। সকলে খুব আশ্চর্য হলেন। কেউ কেউ বিরক্ত প্রকাশও করলেন। কিন্তু বুদ্ধদেব তাতে নিরস্ত হলেন না। রাখালটির খাওয়া হয়ে গেলে তিনি উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। আর শিষ্যদের বললেন, যে ক্ষুধার্ত তার ক্ষুধা দূর না করে তাকে উপদেশ দিতে হয় না।

এরকম আরও অনেক গল্প আছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কথা ও কাহিনী' নামক কবিতার বইয়ে এরকম কয়েকটি কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তার একটি শোন। একবার শ্রাবস্তী নগরে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের একসঙ্গে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষদের খাওয়াবার ভার কে নেবেন। কেউ রাজি হলেন না। একজন বললেন, তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি দিয়েও এ দুর্ভিক্ষ মেটানো যাবে না। যদি যেত তিনি সে ভার নিতেন। আর একজন বললেন, যদি নিজের প্রাণ দিলে দুর্ভিক্ষ দূর হত তবে তিনি তাই করতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাতে তো দুর্ভিক্ষ

প্রিয়দর্শী অশোক
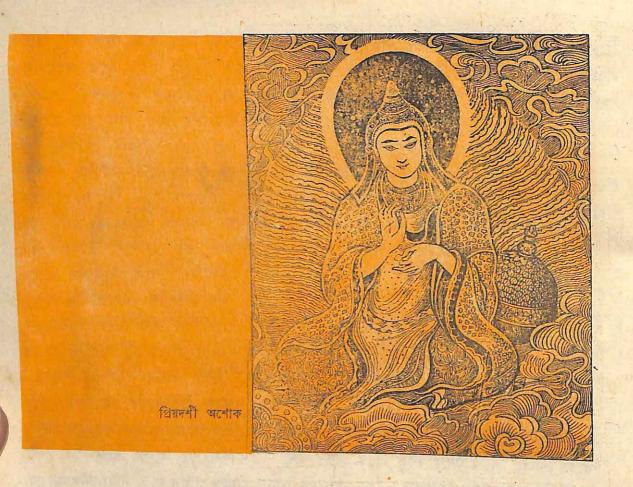
দূর হবে না। বুদ্ধদেব দয়াভরা করুণ চোখে সকলের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন বুদ্ধদেবের একজন শিষ্য অনাথপিণ্ডদের মেয়ে সুপ্রিয়া বললেন, 'আমি ভার নিলাম প্রভু।' অন্যান্য শিষ্যরা তাঁর স্পর্ধা দেখে আশ্চর্য হল। সুপ্রিয়া বললেন, 'আমার একার ভাণ্ডারে সমস্ত শ্রাবস্তীর ক্ষুধিত মানুষের খাদ্য নেই, কিন্তু তোমাদের সকলের ঘরে ঘরে যে খাদ্য আছে তাদের থেকে কিছু কিছু আমাকে দাও, আমি শ্রাবস্তীকে বাঁচিয়ে দেব। আমার এ ভিক্ষা পাত্রটিকে তোমরা সকলে ভিক্ষা দিয়ে পূর্ণ করে দাও। তাহলেই প্রভু বুদ্ধের ইচ্ছা পূর্ণ হবে।'

বুদ্ধদেবের প্রায় তিন শো বছর পরে ভারতবর্ষে একজন ধার্মিক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম প্রিয়দর্শী অশোক। শুধু ভারতবর্ষের নয়, তিনি সারা পৃথিবীরই একজন শ্রেষ্ঠ রাজা। তাঁর সৎকর্ম ও সুশাসনের ফলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের সীমা

ছাড়িয়ে অন্য নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর ভারতবাসীদের চেষ্টায় সেসব দেশে সুন্দর-সুন্দর মন্দির, মূর্তি হল, তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান বাড়ল। অশোক নানা দেশে বুদ্ধের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। দেশের মধ্যে পাহাড়ের গায়ে এবং স্তূপ বা স্তম্ভ তৈরি করে তাদের গায়ে তিনি বুদ্ধের উপদেশ খোদাই করেও দিয়েছিলেন। সেগুলিকে অশোকের অনুশাসন বলা হয়। এভাবে ভারতবর্ষের সুনাম পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। এসবই হল বুদ্ধদেবের উপদেশ ও প্রিয়দর্শী রাজা অশোকের চেষ্টার ফলে।

অশোকের শিলালিপি
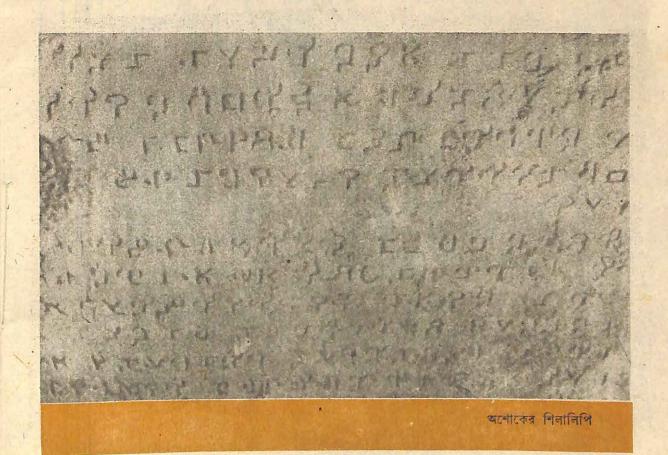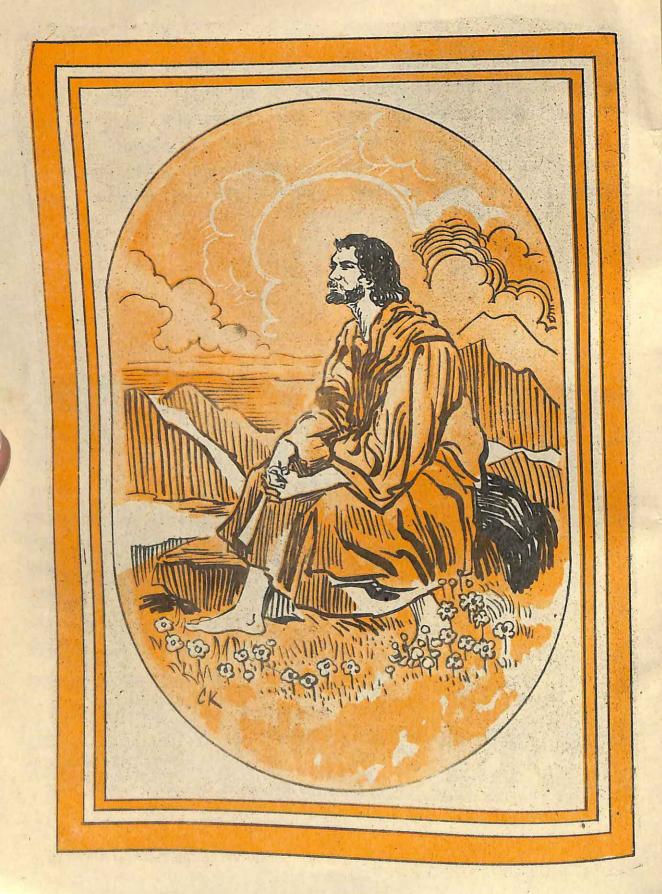
যীশু খ্রিস্ট

বুদ্ধদেবের কাহিনী তোমরা শুনেছ। বুদ্ধদেবের জন্মের প্রায় ছয়শো বছর পরে পৃথিবীতে আর একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম যীশু খ্রিস্ট। বুদ্ধদেবের ধর্মমত যেমন পূর্ব এশিয়ায় বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল, যীশু খ্রিস্টের ধর্মমত তেমনি সারা ইউরোপ, আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের বেশি প্রভাব হলেও যীশু কিন্তু এশিয়ার লোক। এশিয়ার পশ্চিম অঞ্চলে প্যালেস্টাইন বলে একটি দেশ ছিল। প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের বলা হত ইহুদী। যখনকার কথা বলা হচ্ছে তখন প্যালেস্টাইন ছিল রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্যালেস্টাইনের একটি অংশের নাম গ্যালিলি। গ্যালিলি অঞ্চলে নাজারেথ নামে একটি ছোটো শহরে যোসেফ নামে এক দরিদ্র ছুতোর বাস করতেন। অতি কষ্টে তাঁর দিন চলত।

তখনকার দিনের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সরকারী দপ্তরে যোসেফ এবং তাঁর পরিবারের অন্যান্যদের নাম-ধাম লেখাবার জন্য তাঁকে একবার বেথেলহেম শহরে যেতে হল। এই উদ্দেশ্যে শহরে আরও অনেক লোক এসেছিল। প্রচণ্ড ভিড়ে মাথা গোঁজবার ঠাঁই পাওয়া কঠিন। যোসেফ অনেক কষ্টে এক গোয়াল ঘরে জায়গা করে নিলেন। সে ঘরে সেই রাত্রেই যোসেফের পত্নী মেরীর কোলে একটি শিশুসন্তানের জন্ম হল। মেরী এবং মেরীর পুত্রকে নিয়ে যোসেফ বিব্রত হলেন। পুত্রের জন্য বিছানা চাই। গোয়াল ঘরের কোণে ছিল কিছু ঘাস, অগত্যা সেই ঘাস দিয়েই বিছানা তৈরি হল। নবজাতককে ঘাসের বিছানায় শোয়ানো হল। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এইভাবে একটি দীন কুটিরে আবির্ভূত হলেন।

আপনার কোলে যে-শিশুপুত্রটি জন্মেছে, তিনি পৃথিবীকে দুঃখ-তাপ থেকে মুক্ত করবেন

যীশুর জন্ম হয়েছিল পঁচিশে ডিসেম্বর। এই দিনটি এখন সারা পৃথিবীতে একটি পুণ্যদিন বলে গণ্য হয়। একে বলে খ্রিস্টমাস। যাকে আমরা বলি বড়ো-দিন। আর যীশু খ্রিস্টের জন্মবৎসর থেকে যে-বৎসর গণনার পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে, তাকেই বলে খ্রিস্টাব্দ। এই খ্রিস্টাব্দই এখন প্রায় সারা পৃথিবীতে চলে। ইতিহাসের তারিখ গণনা হয় খ্রিস্টাব্দ অনুসারেই।

যীশুর জন্মের পর কিছুদিন কেটে গেল। যোসেফ ও মেরী বেথেলহেম ছাড়ার আগে একদিন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। একরাত্রে পূর্বদেশ থেকে কয়েকজন পণ্ডিত শহরে এসে উপস্থিত। তাঁরা বললেন, আকাশের একটি তারা তাঁদের পথ দেখিয়ে এনেছে। সেই তারাটি যোসেফের ঘরের উপর এসে স্থির হয়ে আছে। মেরীকে তাঁরা বললেন, এই ঘরে আপনার কোলে যে-শিশুপুত্রটি জন্মেছে, তিনি পৃথিবীকে দুঃখ-তাপ থেকে মুক্ত করবেন।" [illegible]জন্যই তাঁর নাম হল 'যীশু' বা 'মেসায়া'। 'যীশু' এবং 'মেসায়া' শব্দের অর্থ হল [illegible]ত্রাতা অর্থাৎ মুক্তিদাতা। পূর্বদেশের ঐ পণ্ডিতেরা নানা রত্নমাণিক্য এবং গন্ধদ্রব্য উপহার দিয়ে যীশুকে বন্দনা করে চলে গেলেন।

দেশের শাসনকর্তার নাম ছিল হেরড। যীশুর আবির্ভাব এবং তাঁর সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী তাঁর কানেও গিয়ে পৌঁছল। তিনি ভাবলেন, যীশুকে লোকেরা এত ভক্তি করতে আরম্ভ করলে তাঁর প্রতিপত্তি একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। সুতরাং যীশুকে যথাসম্ভব শীঘ্র পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। হেরডের মনোভাব বুঝতে পেরে, যোসেফ ও মেরী আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন। কথিত আছে, তাঁরা শিশুপুত্রকে নিয়ে হেরডের নাগালের বাইরে মিশর দেশে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। হেরডের মৃত্যুর পরে তাঁরা আবার দেশে ফিরে নাজারেথে বসবাস করতে লাগলেন।

যীশুর বাল্যকাল দরিদ্র পিতামাতার আদর-যত্নেই কাটল। বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়াও তিনি বেশি শিখতে পারলেন না। বাবার কাছে তিনি ছুতোরমিস্ত্রির কাজ শিখতে লাগলেন। ভবিষ্যতে তাঁকে ছুতোরের কাজ করেই তো সংসার চালাতে হবে।

বিদ্যালয়ে গিয়ে লেখাপড়া না শিখলেও, অল্প বয়স থেকে যীশু ধর্ম কাকে বলে, ঈশ্বর কি, ইত্যাদি নানা কথা বলতে লাগলেন। শুনে লোকেরা অবাক হয়ে যেতে
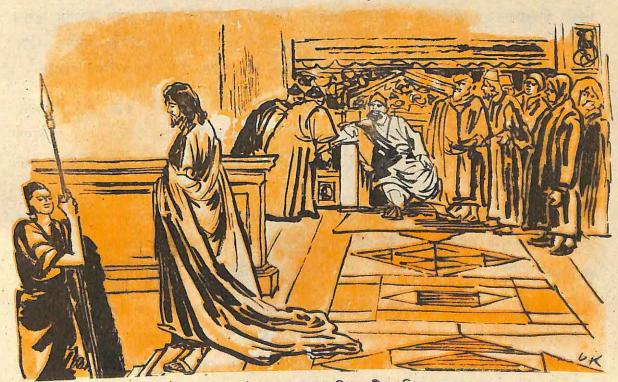
ইহুদিদের প্রধান ধর্ম যাজকরা ও পুরোহিতরা যীশুর বিচার করলেন

লাগল। গল্প আছে, একবার যীশুর পিতামাতা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নানা জায়গায় খুঁজে শেষে তাঁকে তাঁরা দেখতে পেলেন শহরের এক মন্দিরের মধ্যে। সেখানে ঢুকে তাঁরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁদের বালকপুত্র বড়ো-বড়ো বয়স্ক পণ্ডিতদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করছেন আর পণ্ডিতেরা মুগ্ধ হয়ে যীশুর বাণী শুনছেন। ক্রমে ক্রমে যীশু যে ঈশ্বর প্রেরিত অনন্যসাধারণ পুরুষ এ সম্বন্ধে লোকের বিশ্বাস দৃঢ় হল।

প্যালেস্টাইনের অধিবাসীরা ছিল ধর্মে ইহুদী। তাঁদের ধর্মগ্রন্থের নাম বাইবেল। যীশু এই গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে ফেললেন। পরে বাইবেলের আরও একটি নূতন অংশ রচিত হয়, যীশুর জীবন ও উপদেশ দিয়ে। তাকে বলে 'নিউ টেস্টামেণ্ট' বা নূতন অনুশাসন। বাইবেলের পুরনো অংশকে বলা হয় 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট' বা পুরনো অনুশাসন।

প্যালেস্টাইনের পূর্বপ্রান্তে জর্ডন বলে একটি নদীর তীরে যোহন বলে এক সাধু বাস করতেন। তিনি যীশুর দূর-সম্পর্কের ভাই। যোহনের উপদেশ অনেক ভক্তের মন জয় করেছিল। এই ভক্তেরা জর্ডন নদীর জলে স্নান করে পবিত্র হয়ে, যোহনের কাছে দীক্ষা নিতেন। যোহন শান্তচিত্তে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতেন। যোহনের বাণী যীশুকে মুগ্ধ করল। তিনি ভাবলেন তিনিও যোহনের শিষ্য হয়ে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের সাধনায় জীবন অতিবাহিত করবেন। একদিন তিনিও জর্ডন নদীর জলে স্নান করে যোহনের কাছে দীক্ষা নিলেন। তখন তাঁর বয়স ত্রিশ বৎসর।

এর পর আরম্ভ হল যীশুর সত্যিকারের কাজ। সূত্রধরের কাজ ছেড়ে এবার তিনি মানুষকে কল্যাণ ও শান্তির পথে পরিচালিত করার কাজ গ্রহণ করলেন। মানুষের শুভবুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলা আর ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠল।

সহজ ভাষায় যীশু খুব সহজ কথা বলতেন। তাঁর মতে সমস্ত মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর সকলের পিতা। পিতাকে জানবার জন্য কোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, সুদ্ধ মনের ইচ্ছাতেই তাঁকে জানা যায়। এই হল যীশুর উপদেশ।

ইহুদী ধর্মের ফরিশি পুরোহিতরা মনে করতেন, ঈশ্বরের পূজা ও ধর্ম প্রচারের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই। তাঁদের মারফৎ-ই ঈশ্বরকে পেতে হবে—এই ছিল তাঁদের অনুশাসন। ঈশ্বরকে পূজা করার সকল আচার-অনুষ্ঠান কেবল পুরোহিতরাই করবেন।

তার জন্য সাধারণ মানুষকে প্রণামী দিতে হবে। যীশুর উপদেশে ফরিশি পুরোহিতদের প্রতিপত্তি কমে যেতে লাগল। তাঁদের প্রণামীও বন্ধ হয়ে গেল। কাজেই তাঁরা প্রমাদ গুণলেন। দরকার হলে যীশুকে হত্যা করেও তাঁদের প্রতিপত্তি রক্ষা করতে হবে। তাঁরা ষড়যন্ত্র শুরু করলেন।

যীশুর কানে ষড়যন্ত্রের কথা পৌঁছল কিন্তু তিনি পেছ-পা হবার পাত্র ছিলেন না। তিনি নির্ভয়ে এবং নূতন উৎসাহে তাঁর বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর চেহারা যেমন সুন্দর, তাঁর কণ্ঠস্বরও তেমনি মধুর, তাঁর উপদেশ লোকের মনে গেঁথে যেতে লাগল। ধর্ম-উপদেশকে সহজ করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে নানা গল্প বলতেন। সে-গল্পগুলি বাইবেলের 'নূতন অনুশাসন' বা 'নিউ টেস্টামেণ্ট'-এ লিখিত আছে।

শিশুদের যীশু খুব ভালোবাসতেন

একটি গল্প বলছি, শোন। একদিন একজন লোক যীশুকে জিজ্ঞাসা করল, "প্রভু, স্বর্গে যাবার উপায় কি?" যীশু তাঁকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "এ বিষয়ে শাস্ত্রে কি লেখা আছে তুমি জান?" লোকটি বলল, "শাস্ত্রে আছে ঈশ্বরকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে পারলে এবং প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে পারলেই স্বর্গলাভ হয়।" যীশু বললেন, "তবে তুমিও তাই কর।" লোকটি আবার প্রশ্ন করল, "আমার প্রতিবেশী কে, কি করে জানব?"

যীশু তখন সহজ কথায় একটি গল্প বললেন। সেটি এই: একদিন এক ইহুদী দস্যুদের হাতে পড়ে। দস্যুরা তার সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে আধমরা অবস্থায় রাস্তায় ফেলে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরে জেরুজালেমের মন্দিরের এক পুরোহিত ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু লোকটিকে ওরকম অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেও তিনি তাকে কোনো সাহায্য করলেন না। আরও কিছুক্ষণ পরে মন্দিরের গায়ক এলেন। তিনিও আহত লোকটিকে দেখে পুরোহিতের মতোই পাশ কাটিয়ে নিজের কাজে চলে গেলেন। তারপর গাধার পিঠে চড়ে একটি অস্পৃশ্য শমরীয় সে পথ দিয়ে এল। লোকটির অবস্থা দেখে সে গাধার পিঠ থেকে নেমে লোকটির ক্ষতস্থানগুলি যত্ন করে বেঁধে দিল। তারপর তাকে নিজের গাধার পিঠে চড়িয়ে কাছের এক সরাইখানায় নিয়ে গিয়ে, সরাইখানার মালিককে কিছু টাকা দিয়ে বলল, "এই আহত লোকটিকে সেবা করার ভার আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। আমাকে বিদেশ যেতে হবে। ফেরার পথে আপনার যদি কোনো পাওনা থাকে তবে তা-ও দিয়ে যাব।" সরাইখানার মালিক শমরীয়ের মহানুভবতায় মুগ্ধ হলেন এবং যথাসম্ভব শুশ্রূষা করে লোকটিকে সুস্থ করে তুললেন।

এই গল্পটি বলে যীশু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন বল তো আহত লোকটির যথার্থ প্রতিবেশী কে?" লোকটি বলল, "ওই দয়ালু শমরীয়।" যীশু বললেন, "তুমিও ওই শমরীয়ের মতো সকলের প্রতিবেশী হবার চেষ্টা কর, তাহলেই স্বর্গরাজ্যে যেতে পারবে।"

এভাবেই যীশু ধর্মের মূলকথাগুলি সহজ করে সকলের মনে গেঁথে দিতে চেষ্টা করতেন। জপতপ আচার-অনুষ্ঠান ছেড়ে শুধু মানুষের সেবা করলে, বা মানুষকে ভালোবাসলেই ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করা হয়, একথা তিনি নানা সময়ে নানাভাবে বলে গিয়েছেন।

শিশুদের যীশু খুব ভালোবাসতেন। একবার অনেক মেয়েমানুষ তাঁদের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যীশুর আশীর্বাদ চাইতে এলেন। যীশু তাদের আশীর্বাদ করলেন। কিন্তু ভিড় কমছে না দেখে যীশুর এক শিষ্য মায়েদের বললেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের সরিয়ে নিতে। শিষ্যের ওই কথা শুনে যীশু খুব দুঃখিত হলেন। তিনি বললেন, "না, শিশুদের আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিও না। মনে রেখো, শিশুরাই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সৃষ্টি করেছে। তোমরা শিশুর মতো সরল ও নম্র না হতে পারলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পাবে না। আর শিশুদের যে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে।"

মানুষের সেবার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরকে পেতে হবে একথা যীশু কেবল মুখেই বলেননি, কাজেও দেখিয়ে গিয়েছেন। তাঁর সেবাতে ও করুণায় কত ব্যাধিগ্রস্ত লোক, কত অন্ধ, কত পঙ্গু রোগমুক্ত হয়েছে, তার হিসেব করা যায় না। লোকেদের বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, যীশুর হাতের স্পর্শ পেলে নিমেষের মধ্যে ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা রোগমুক্ত হয়ে যাবে।

যীশুর শিষ্য এবং অনুরাগীদের সংখ্যা যতই বাড়তে লাগল ততই ফরিশি পুরোহিতদের আশঙ্কা বাড়তে লাগল। তাঁরা জোট বেঁধে ঠিক করলেন, কঠিন অপরাধের অভিযোগ এনে যীশুকে কঠোর সাজা দিতে হবে। যীশুর শিষ্যরা তাঁকে ঘিরে থাকতেন বলে তাঁকে ধরা খুব সহজ ছিল না। কিন্তু পুরোহিতেরা টাকা দিয়ে জুডাস নামে যীশুর এক লোভী শিষ্যকে বশ করলেন। তার বিশ্বাসঘাতকতায় যীশু শত্রুদের হাতে বন্দী হলেন।

ইহুদীদের প্রধান ধর্মযাজকরা ও পুরোহিতরা নিজেদের মধ্যে যীশুর বিচার করলেন। যীশুর সরল ধর্ম-প্রচার এবং আচার-অনুষ্ঠান ত্যাগ করার উপদেশকেই তারা অপরাধ বলে ধরে, তাঁর প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত বলে স্থির করলেন। কিন্তু প্রাণদণ্ড দেবার ক্ষমতা তাঁদের ছিল না বলে যীশুকে রোমসম্রাটের প্রতিনিধির দরবারে নিয়ে যাওয়া হল। পুরোহিত এবং যীশুর অন্যান্য শত্রুদের চাপে পড়ে সে প্রতিনিধি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে প্রাণদণ্ড দিলেন। প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়ে তিনি বললেন, "যীশুর মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী হব না। তোমরাই তার শাস্তি দেবার ভার নাও।"

ফরিশি পুরোহিত এবং তাঁদের ইহুদী শিষ্যরা যেন ক্ষুধার্ত বাঘের মতো যীশুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁকে নানা রকম যন্ত্রণা দেওয়া হল। মাথায় কাঁটার মুকুট

পরিয়ে তাঁর কাঁধে একটি ক্রুশ চাপিয়ে দেওয়া হল। বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে সে ক্রুশের গায়েই তাঁর হাত-পা পেরেক দিয়ে গেঁথে দেওয়া হল। শেষ নিঃশ্বাস নেবার আগে অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও যীশু তাঁর অত্যাচারীদের ক্ষমা করে বললেন, "হে ঈশ্বর, তুমি এ'দের ক্ষমা করো। এরা যে কি অপরাধ করল তা এরা জানে না।" ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে 'ক্রুশ-চিহ্ন'কে সকল খ্রিস্টানরা একটি পবিত্র চিহ্ন বলে মনে করেন।

যীশুর মৃত্যুর পর যে পৃথিবী থেকে অন্যায় অবিচার দূর হয়ে গেল, তা নয়। কিন্তু যীশু যে উপায়ে মানুষকে সৎপথে চালিত করতে চেয়েছিলেন, সেটা সকল মানুষের পক্ষে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। যারা অসত্য এবং নিষ্ঠুরতা মেনে চলে তারা আজও পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই রবীন্দ্রনাথ যীশুকে মনে করে বলেছেন

একদিন যারা মেরেছিল তাঁরে গিয়ে,
রাজার দোহাই দিয়ে,
এ যুগে তারাই জন্ম নিয়েছে আজি,
মন্দিরে তারা এসেছে ভক্ত সাজি।

কিন্তু বুদ্ধদেব যীশু প্রমুখ মহাপুরুষদের প্রভাব গোপনে কাজ করে চলেছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
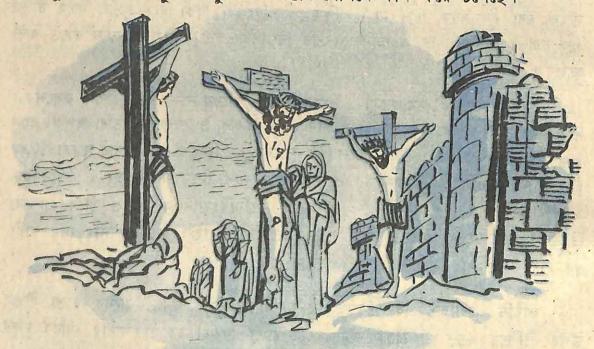
কালিদাস

মহাভারতের কাহিনী তোমরা পড়েছ, রামায়ণের কাহিনীও তোমাদের জানা। মহাভারত বেদব্যাস' এবং রামায়ণ 'বাল্মীকি'র রচিত বলে প্রসিদ্ধি আছে। 'বেদব্যাস' এবং 'বাল্মীকি'র পর প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে সবচেয়ে প্রথমে যাঁর নাম মনে পড়ে, তিনি হলেন 'কালিদাস'। দুঃখের বিষয়, 'বেদব্যাস' এবং 'বাল্মীকি'র মতোই তাঁর জীবনের কাহিনী কেউ জানে না। কিন্তু কালিদাস সম্বন্ধে নানা গল্প শোনা যায়। নিষ্ঠুর দস্যু রত্নাকর যেমন দেবতার দয়ায় মহাকবি বাল্মীকি হয়েছিলেন, মহামূর্খ কালিদাসও তেমনি দেবী সরস্বতীর বরে অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী হয়েছিলেন, এরকম গল্পও আছে।

কালিদাস রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। বিক্রমাদিত্য সাহিত্য, সংগীত এবং নানা বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সভায় নয়জন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত এবং কবি বিরাজ করতেন। তাঁদের বলা হত নবরত্ন। এই নবরত্নের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল রত্নটি হলেন মহাকবি কালিদাস।

এই বিক্রমাদিত্যের পরিচয় এবং সময় নিয়ে কিছু মতভেদ আছে। তবে অনুমান করা হয় যে, প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজবংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই এই বিক্রমাদিত্য। তাঁর পিতামহের নামও ছিল চন্দ্রগুপ্ত। সেজন্য তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে খ্যাত। বহু জাতিকে পরাজিত এবং নানা দেশ জয় করে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শুধু বড়ো যোদ্ধাই ছিলেন না, তাঁর মতো সুশাসক সম্রাটও খুব কমই দেখা যায়। আর তিনি যে বিদ্বানদের খুব সম্মান করতেন, একথা তো আগেই তোমরা শুনেছ।

কথিত আছে, কালিদাস প্রথম জীবনে মহামূর্খ ছিলেন। কিন্তু দৈবক্রমে এক পরম বিদুষী রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের রাত্রিতে রাজকন্যা যখন স্বামীর পরিচয় পেলেন তখন তাঁকে অপমান করে বাসর-ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলেন। স্ত্রীর কাছে অপমানিত হয়ে কালিদাস মনের দুঃখে এক সরোবরের তীরে গিয়ে দেবী সরস্বতীর উপাসনা করতে লাগলেন। বিদ্যার দেবী যেন তাঁর মূর্খতা ঘুচিয়ে তাঁকে বিদ্বান করে দেন, এই ছিল তাঁর প্রার্থনা। প্রার্থনায় খুশি হয়ে সরস্বতী তাঁর সামনে এসে তাঁকে বর দেন। তার ফলেই কালিদাস পরবর্তীকালে কবি ও পণ্ডিত বলে খ্যাত হন। এ কাহিনী পরবর্তীকালে তৈরী হয়েছিল। বাল্মীকির দস্যুবৃত্তি ছেড়ে কবি হবার মতোই এ কাহিনী অনেকদিন ধরে প্রচলিত।

কালিদাস অনেক কাব্য লিখেছিলেন। তার মধ্যে 'মেঘদূত', 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব' কাব্য এবং 'শকুন্তলা' নাটকেরই সবচেয়ে বেশি আদর। মেঘদূতের কাহিনী অতি সুন্দর। এক যক্ষ প্রভুর শাপে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত হয়েছিলেন। সেখানে স্ত্রীর কথা তাঁর সর্বদাই মনে হত। একদিন বর্ষার প্রারম্ভে একটি মেঘখণ্ডকে দূত বলে কল্পনা করে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠাতে চাইলেন। মেঘের যাবার পথের বিবরণ দিয়ে মেঘদূতের 'পূর্বমেঘ' অংশ লেখা হয়েছে। অলকা নগরীতে পৌঁছে কি করে তাঁর স্ত্রীর কাছে তাঁর কথা বলবেন সে নিয়ে 'উত্তর মেঘ' অংশ রচিত। তোমরা বড়ো হয়ে যখন মেঘদূত পড়বে, তখন সেকালের ভারতবর্ষের একটি চিত্র তোমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে।

'রঘুবংশ' লেখা হয়েছিল রামায়ণের কাহিনী নিয়ে। তবে বাল্মীকির রামায়ণে যে কাহিনী আছে সে-অংশটি রঘুবংশে ছোটো করে লেখা হয়েছে। রামের জন্মের আগে তাঁর পূর্ব-পুরুষদের কাহিনী নূতন করে লেখা হয়েছে।

'কুমারসম্ভব' কাব্যের কাহিনী এই রকম। দেবতারা অসুরের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে জানতে পারলেন যে শিবের পুত্র কার্তিক অসুরদের দমন করতে পারবেন। কিন্তু শিব তপস্যায় মগ্ন, বিয়েও করেননি। হিমালয়ের কন্যা উমা মনে-মনে তাঁকে স্বামীরূপে বরণ করে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করতে চেষ্টা করলেন। বিফল হয়ে তিনিও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বিবাহ করেন। এই কাব্যে হিমালয়ের বর্ণনা অতি সুন্দর।

'শকুন্তলা' নাটক পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলে পরিচিত। বিদেশের এক কবি বলেছিলেন, পৃথিবীর মধ্যে যদি স্বর্গ দেখতে চান তবে শকুন্তলা পড়তে হবে। মহাভারতের একটি ছোটো কাহিনী এবং শকুন্তলার পুত্র ভরতের জন্ম নিয়ে এই নাটক রচিত। কথিত আছে এই ভরতের নাম থেকেই ভারতবর্ষ বলে আমাদের দেশের নাম হয়েছিল। সেটা হয়তো সত্যি নয়।

কালিদাস বহুদিন ধরে ভারতবাসী এবং বিদেশীদের সম্মান লাভ করে আমাদের দেশকে ধন্য করেছেন। তাঁর পরের প্রায় সকল বিখ্যাত কবি তাঁর কাব্যকে অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে সুন্দর ভাষায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। বড়ো হয়ে তোমরা যখন কালিদাসের কাব্য পড়বে তখন রবীন্দ্রনাথের কালিদাস সম্বন্ধে প্রবন্ধও পড়বে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হজরত মহম্মদ

বুদ্ধদেবের জন্মের বার শো বছর পরে এবং খ্রিস্টের জন্মের প্রায় পাঁচশো সত্তর বছর পরে আরব দেশের অন্তর্গত মক্‌কা শহরে আর একজন মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর প্রচারিত ধর্মও পৃথিবীর অগণিত জনগণ গ্রহণ করেছে। এই মহাপুরুষের নাম হজরত মহম্মদ এবং তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম।

হজরত মহম্মদের বাল্যকাল খুব দারিদ্র্যের মধ্যে কেটেছিল। তাঁর পিতা আবদুল্লা তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে মারা যান। তাঁর ছ-বছর বয়সে তাঁর মা আমিনাও ইহলোক ত্যাগ করেন। মহম্মদ পিতামহ ও পিতৃব্যের কাছে মানুষ হতে থাকেন।

আর্থিক অনটনের জন্য বাল্যকালে মহম্মদকে পশুচারণের কাজও করতে হয়েছিল। ব্যাবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাঁর পিতৃব্যকে সিরিয়া, দামাস্কাস, বাগদাদ ইত্যাদি জায়গায় যেতে হত। কয়েকবার তিনি মহম্মদকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। এর ফলে নূতন দেশ ও মানুষের সঙ্গে মহম্মদের পরিচয় হয়েছিল এবং ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই সময়ে নানা স্থানে ইহুদী ও খ্রিস্টান ধর্মপ্রাণ বহু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়েছিল। ফলে তাঁর মনেও ধর্ম সম্বন্ধে নূতন চেতনা জাগে। এরই পরিণামে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তকরূপে পৃথিবীর মানুষের শ্রদ্ধা লাভ করেন।

খাদিজা নামে এক ধর্মপ্রাণা ধনশালিনী মহিলা তখন ওই অঞ্চলে বাস করতেন। মহম্মদের সাধুতা ও কর্মক্ষমতার কথা জেনে তিনি তাঁকে নিজের ধনসম্পত্তির কাজ পরিচালনার ভার দিলেন। মহম্মদও খুব সাধুতার সঙ্গে তাঁর এই নূতন দায়িত্ব পালন করেন। খাদিজা মহম্মদের মহৎ চরিত্র এবং কর্তব্যনিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন। খাদিজার সঙ্গে বিবাহের পর তাঁর আর অভাব অনটন রইল না। তখন তিনি পরিপূর্ণভাবে ধর্মচিন্তায় মন সমর্পণ করলেন।

মহম্মদের সময়ে আরব দেশের লোকেরা কুসংস্কারের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল ও তাদের সৎ-জ্ঞানের অভাব বিশেষভাবে দেখা দিয়েছিল। মদ্যপান, জুয়াখেলা, লুটপাট, খুনোখুনি দেশের মধ্যে লেগেই ছিল। তাদের মধ্যে দাসপ্রথা তখন বিশেষভাবে প্রচলিত। সামান্য অপরাধে দাস-দাসীর প্রতি মালিকেরা অকথ্য অত্যাচার করতেন। এই রকম ভয়াবহ ও অশান্ত অবস্থায় মহম্মদের আবির্ভাব হল। তিনি দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সমাজে শৃঙ্খলা ও মানুষে-মানুষে সদ্‌ভাব স্থাপনের মহৎ কাজে ব্রতী হলেন। তার জন্য চাই ধর্মপরায়ণতা ও এক ঈশ্বরে ভক্তি। এই আল্লাহ্ বা ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ধর্মপরায়ণতা হ'ল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এই কঠিন কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই তিনি জীবন সমর্পণ করলেন।

মহম্মদ প্রথমেই তাঁর জীবনসঙ্গিনী খাদিজার কাছে এসে তাঁর উপলব্ধি ও সংকল্পের কথা জানালেন। খাদিজা তাঁর সহায় হলেন। আগেই বলেছি, আরব-দেশের লোকেরা তখন ছিল অশিক্ষিত ও অজ্ঞান। তাদের মন ছিল নানা কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। তাদের ধর্ম ছিল আদিম প্রকৃতির। এক আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের ধারণা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। গাছ পাথর প্রভৃতি নানা পদার্থকে তারা কল্পিত দেবতা-রূপে পুজো করত। এসব অজ্ঞ লোকদের শিক্ষিত করে এক আল্লাহ্ বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী করা সহজ ছিল না। কিন্তু মহম্মদ তাতে পিছ্-পা না হয়ে ধীরে-ধীরে অগ্রসর হলেন।

পত্নী খাদিজা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মহম্মদ প্রথম নিজের ধর্মমতে দীক্ষিত করলেন। এই ধর্মের নাম হ'ল 'ইসলাম' এবং দীক্ষিতদের নাম হল 'মুসলমান'। 'ইসলাম' অর্থে শান্তি এবং আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণ।

মহম্মদ এরপর মক্কার জনসাধারণকে এই ধর্মমতের কথা বলে তাঁদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াসে ব্রতী হলেন। আরববাসীরা সহজে তাদের বহুদিনের অভ্যস্ত ধর্মকে ত্যাগ করতে রাজি হল না। তারা মহম্মদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। কেউ-কেউ তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করতে লাগল। তিন বছরে তাঁর শিষ্য সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র চল্লিশ জন। কাজেই মহম্মদের শত্রুরা তাঁকে ভয় দেখিয়ে ধর্মপ্রচার থেকে নিরস্ত করতে চাইল! কিন্তু যিনি স্বয়ং আল্লার আহ্বান শুনেছেন, তাঁকে কি এত সহজে নিরস্ত করা যায়?

মহম্মদের উপর তো অত্যাচার চললই, তাঁর শিষ্যরাও নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পেলেন না। কিন্তু আল্লার প্রতি গভীর বিশ্বাসে এবং মহম্মদের প্রেরণায় তাঁরা হাসিমুখে সে-সব অত্যাচার সহ্য করতে লাগলেন।

যখন অত্যাচারের মাত্রা চরম হয়ে উঠল এবং তাঁর শিষ্যদের উপর অকথ্য নির্যাতন চলতে লাগল, তখন মহম্মদ ঠিক করলেন তিনি শিষ্যদের নিয়ে মক্কা থেকে চলে যাবেন। তাঁর আদেশে প্রথমে তাঁর ভক্তরা একদিন মদিনায় চলে গেলেন। তারপর তিনিও মদিনায় গেলেন। তখন তাঁর বয়স বাহান্ন বৎসর। মহম্মদের মদিনায় যাবার দিনটিকে সব মুসলমানরা পবিত্র মনে করেন। ইসলাম-ধর্মের প্রসার মহম্মদের মদিনা যাবার পরই আরম্ভ হল। মুসলমান জগতে প্রচলিত 'হিজরী' অব্দ মহম্মদ যেদিন মক্কা ছেড়ে মদিনায় গিয়েছিলেন সেদিন থেকেই গণনা করা হয়।

মক্কা
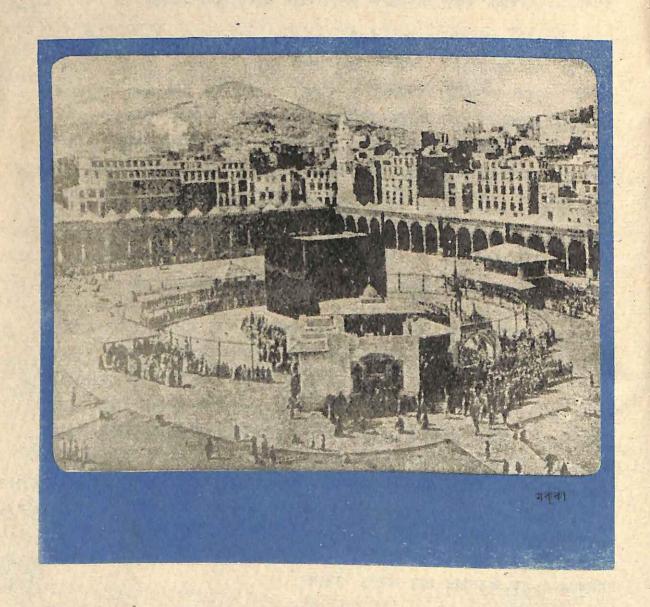
মদিনাবাসীরা মহম্মদকে এবং তাঁর মক্কাবাসী শিষ্যদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। মদিনায় মহম্মদকে ধর্মপ্রচারে বিশেষ কোনো বেগ পেতে হল না। তাঁর অনেক নূতন শিষ্যও হল। দেখতে-দেখতে মদিনাই ইসলামধর্ম প্রচারের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল। প্রথম ধর্মপ্রচারের স্থান হিসাবে ঋষিপত্তন (সারনাথ) বৌদ্ধদের ইতিহাসে যেমন প্রসিদ্ধ, মুসলমানদের ইতিহাসে মদিনাও তেমনি প্রসিদ্ধ। মদিনাতেই তৈরি হল মুসলমানদের প্রথম সমবেত উপাসনা-গৃহ বা মসজিদ। সেই মসজিদে মহম্মদ ও তাঁর শিষ্যেরা সমবেত হয়ে পরমেশ্বরের উপাসনা করতেন।

কয়েক বৎসর মদিনায় ধর্মপ্রচার করার পর মহম্মদ আবার মক্কায় ফিরে এলেন। এ-কয় বছরে মদিনা এবং আশেপাশের সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা অনেকেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মক্কাবাসীদের মধ্যে অনেকে তখনও তাঁর বিরোধিতা করতে লাগলেন। এইবার প্রয়োজনের সময়ে মহম্মদ তরবারি হাতে তুলে নিলেন। প্রথমে যুদ্ধ করে তিনি তাঁর শত্রুদের পরাজিত করলেন। কিন্তু তাঁদের শাস্তি না দিয়ে ক্ষমা করে, তাঁদের মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করলেন। একসময় যাঁরা মহম্মদের চরম শত্রু ছিলেন, তাঁরা মহম্মদের করুণায় এবং মহত্ত্বে তাঁর পরম অনুরাগী হয়ে উঠলেন। এইভাবে মক্কা ও সমস্ত আরবদেশ জয় করে, তিনি আবার মদিনায় ফিরে এলেন। মদিনাতেই তেষট্টি বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হল।

মুসলমান ধর্মের বিশেষত্ব হল এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস। তাঁকে অন্তরের মধ্যে ভক্তি করাই এই ধর্মের বিধান। মুসলমানরা প্রতিমা-পূজায় বিশ্বাসী নন। তাঁদের ধর্মের আর একটি বড়ো কথা হল, সকল মানুষই পরমেশ্বরের বা আল্লাহ্‌র বান্দা বা দাস। কাজেই মানুষমাত্রেই ভাই। তাদের মধ্যে ছোটো-বড়ো ভেদ নেই।

মুসলমানেরা মহম্মদের পূর্বে আবির্ভূত অনেক ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষকে আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরের দূত বলে মনে করেন। তাঁদের মতে মহম্মদই হলেন ঈশ্বরের শেষ দূত বা পয়গম্বর।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থকে বলা হয় 'কোরাণ'। এটি আল্লাহ্‌ বা ঈশ্বরের বাণী বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন। তাই এটি তাঁদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। ভক্তিভরে কোরাণ-পাঠ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। আর মক্কায় গিয়ে 'হজ'-সম্পাদন বা তীর্থ-ভ্রমণ প্রত্যেক ধার্মিক মুসলমানই পরম কাম্য বলে মনে করেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অজন্তা ও ইলোরার গুহাচিত্র
এবং
পুরী ও কোনারকের মন্দির

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের শিল্পের কাজ সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। মহেঞ্জোদারো বা হরপ্পার কথা তোমরা পড়নি? খ্রিস্টের জন্মের অন্তত

অজন্তা গুহাশ্রেণী

অজন্তা গুহার প্রবেশপথ
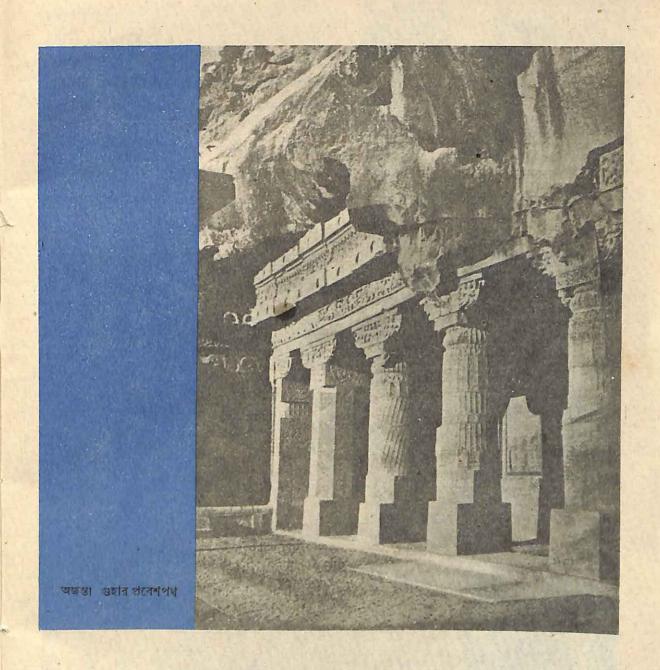
তিন হাজার বছর আগে এই শহরগুলি তৈরী হয়েছিল। সেগুলির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে নানা সুন্দর-সুন্দর শিল্পের নমুনা পাওয়া গিয়েছে। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্মকে আশ্রয় করে শিল্পের আরও উন্নতি হয়। বৌদ্ধস্তূপ ও স্তম্ভ এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসস্থান 'বিহার' বা 'সংঘারাম' প্রভৃতিতে নানা ধরনের শিল্পের পরিচয় আছে।

হিন্দু দেবদেবীর মন্দিরও ভারতবর্ষে অগণিত। সেগুলিতে একদিকে যেমন নানা ধরনের সুন্দর-সুন্দর দেবদেবীর মূর্তি আছে তেমনি আবার মন্দিরের ভিতরের ও বাইরের কারুকার্য অপূর্ব। এরকম দুটি সংঘারাম বা বৌদ্ধভিক্ষুদের বাসস্থান এবং দুটি মন্দিরের পরিচয় দেব।

প্রাচীনকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা স্তূপ বা চৈত্য স্থাপন করে তার সামনে উপাসনা করতেন। তাঁরা অনেক সময় গুহায় বাস করতেন। লোকালয় থেকে দূরে তাঁদের

অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্র

এই বাসস্থানের নাম ছিল বিহার বা সংঘারাম। একটি গুহায় চৈত্য থাকত, অন্য গুহাগুলিতে ছিল থাকবার জায়গা।

বর্তমান মহারাষ্ট্রের এক জায়গায়, একটি খুব প্রাচীন গুহার মধ্যে অবস্থিত পুরনো এক বিহার-এর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। গুহাগুলির কিছু দূরে 'অজন্তা' বলে একটি গ্রাম আছে। তার থেকেই গুহাগুলি 'অজন্তা গুহা' নামে পরিচিত। এই গুহাগুলির মধ্যে অপূর্ব সুন্দর কতগুলি ছবি আঁকা হয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন বিক্রমাদিত্য ও অন্যান্য গুপ্ত-রাজারা রাজত্ব করছেন।

অজন্তার অনেক ছবি এবং শিল্পকাজ এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যা আছে তার তুলনা পৃথিবীতে বড় বেশি নেই। অজন্তার প্রবেশপথে পাথরের কাজ খুব সুন্দর। ছটি গুহার ছবি এখনও মোটামুটি ভালো আছে। গুহার সব দেয়ালে, এমন কি ভিতরের ছাদেও ছবি আঁকা রয়েছে।

রাহুল ও যশোধরা
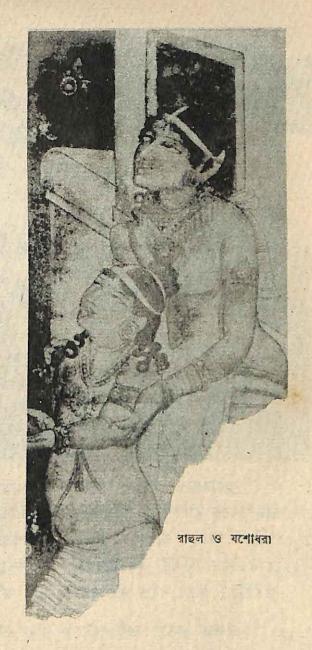
গুহার এবড়ো-খেবড়ো পাথরকে শিল্পীরা খুব সুন্দর উপায়ে মসৃণ করে নিয়েছিলেন। যে-রঙগুলি দিয়ে ছবি আঁকা হয়েছিল সেগুলিও আমাদের আশেপাশের নানা জিনিস থেকে সংগ্রহ করতেন। চুন থেকে সাদা রঙ, হলদে মাটি থেকে হলদে রঙ, লাল মাটি থেকে লাল রঙ এবং গেরি মাটি থেকে গেরুয়া রঙ তাঁদের প্রিয় ছিল। ছবিতে রঙ দেবার ব্যাপারে এই শিল্পীদের দক্ষতা আজও সকলকে আশ্চর্য করে।

অজন্তা গুহার ভিতর আঁকা ছবি
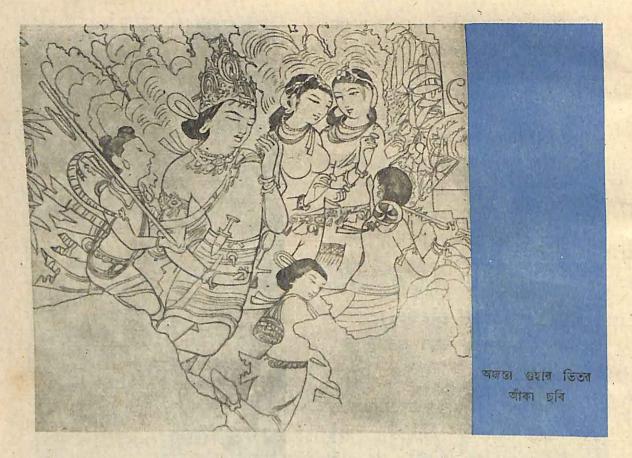
সাধারণতঃ বৌদ্ধ জাতকের কাহিনী থেকেই সব ছবি আঁকা হয়েছে। তার থেকে সেকালের লোকেদের জীবন-যাত্রা, আচার-ব্যবহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচয় পাওয়া যায়। বুদ্ধ তপস্যা করছেন এবং তাঁকে 'মার' লোভ দেখাচ্ছে,—এ বিষয় নিয়ে ছবিটি খুব সুন্দর। একটি ছবির নাম দেওয়া হয়েছে 'মুমূর্ষু রাজকুমারী'। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত দুঃখের ছবি আঁকা হয়েছে তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ।

অজন্তা থেকে কিছু দূরে 'ইলোরা' নামে আরও কতগুলি গুহা আছে। ইলোরার সংঘারামগুলির কয়েকটি আবার তিন-তলা। এখানে জৈন এবং হিন্দুদের জন্যও কিছু গুহা পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল।

ইলোরার গুহাগুলির মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর কৈলাসনাথের মন্দির। এটিও পাথর কেটে তৈরি। কৃষ্ণরাজ নামে একজন রাজার আমলে এ-মন্দির তৈরি হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে অনেক পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে খোদাই-করা চমৎকার মূর্তি আছে।

ইলোরা গুহা
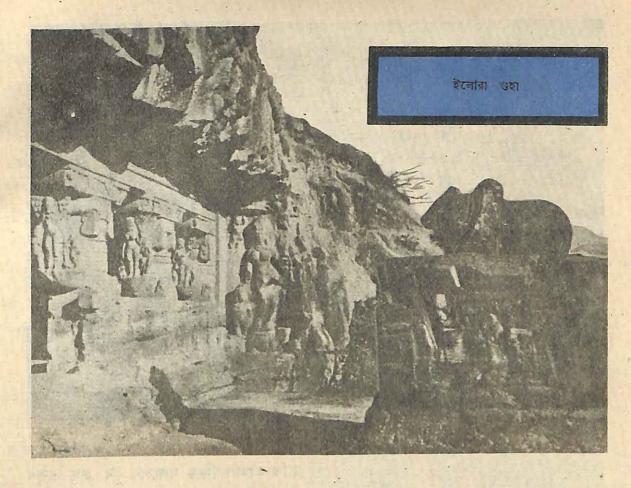
একটি মূর্তি হচ্ছে রাবণের। গোটা কৈলাসপর্বত সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে তিনি মাথায় তুলে ধরেছেন। এই নিখুঁত মূর্তিটি শ্রেষ্ঠ শিল্পের নিদর্শন।

অজন্তার মতো ইলোরার গুহার দেয়ালেও ছবি আঁকা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি এখন প্রায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

বর্তমান ওড়িষা রাজ্যে সমুদ্রের তীরে পুরী শহরের কথা তোমরা নিশ্চয়ই জান। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির শুধু হিন্দুদের তীর্থস্থানই নয়, মন্দিরের কারুকার্য এবং গড়ন অতি উঁচু ধরনের। এই মন্দিরে সুভদ্রা, বলরাম এবং জগন্নাথের কাঠের মূর্তি আছে। সে-মূর্তিগুলিও আবার অদ্ভুত ধরনের। তাদের হাত-পা নেই। এ-সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা একুশ দিনের মধ্যে তিনটি মূর্তি তৈরী করে দেবার জন্য একজন বৃদ্ধ শিল্পীকে নিযুক্ত করেছিলেন। শিল্পী মূর্তি তৈরি করতে

জগন্নাথদেবের মন্দির
পুরী

রাজি হলেন কিন্তু বললেন যে এই একুশ দিন তিনি একটি বন্ধ-ঘরে কাজ করবেন। সে-ঘরে কেউ যেতে পারবে না। গেলে কাজ বন্ধ করে শিল্পী চলে যাবেন। এদিকে

পুরী মন্দিরের
জগন্নাথদেবের মূর্তি

শিল্পী তো কাজ করছেন, কিন্তু চোদ্দ দিনের মাথায় রাজা আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। রানীর পরামর্শে ঘরে ঢুকে পড়লেন। ঢুকে দেখেন মূর্তিগুলির হাত-পা তখনও তৈরি হয়নি; আর শিল্পীও উধাও হয়েছেন। রাজা দুঃখিত হয়ে মন্ত্রীকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। মন্ত্রী বললেন, "ওই শিল্পী স্বয়ং জগন্নাথ। আপনি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাতে জগন্নাথ চলে গিয়েছেন।" রাজার খুব অনুতাপ হল। তিনি ঠিক করলেন, কুশের শয্যায় শুয়ে তিনি অনাহারে প্রাণত্যাগ করবেন। কিন্তু জগন্নাথ তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "আমার অসম্পূর্ণ মূর্তিই তুমি মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর। আমার হাত-পা না দেখা গেলেও আমি ভক্তের পূজা গ্রহণ করব।"

চৈতন্যদেবের কথা তোমরা পরে পড়বে। চৈতন্যদেব তাঁর শেষজীবন পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে কাটিয়েছিলেন। তার জন্য এই মন্দিরকে 'গৌরবাটি' বা গৌরের বাড়ি বলা হয়। চৈতন্যদেবের অন্য নাম 'গৌর'।

এ-মন্দিরে অনেক ধন-রত্ন ছিল। একথা শুনে অনেক মুসলমান রাজা এ-মন্দির আক্রমণ করেছিলেন। গৌড় বা বাংলাদেশের সুলতান একসময় এ-মন্দিরের ধনরত্ন অধিকারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূজারীরা আগেই মূর্তি এবং ধনরত্ন গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেছিলেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দির

কোনারকের সূর্যমন্দির

কোনারকের সূর্যদেবের মূর্তি

ওড়িষায় আরও বিখ্যাত মন্দির আছে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের শিল্পও অতি সুন্দর। পুরী থেকে কিছু দূরে সমুদ্রের তীরে আরও একটি বিখ্যাত মন্দির আছে। সেটি কোনারকের সূর্য-মন্দির। এ-মন্দিরের বয়স অন্তত সাত-শো বছর। কিন্তু মূল মন্দিরটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুধু মন্দিরের মণ্ডপটি আছে। এটির শিল্পকর্ম দেখেই দেশ-বিদেশের লোকেরা মুগ্ধ হয়েছে।

সমস্ত মন্দিরটি কালো পাথরে একটি রথের আকারে তৈরী হয়েছিল। মনে হত যেন সূর্যের সাত-রঙের ঘোড়া সূর্যের রথকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মন্দিরটি কালো

কোনারকের হাতী

বলে বিদেশীরা একে বলেন 'ব্ল্যাক প্যাগোডা' বা 'কালো মন্দির'। মন্দিরের গায়ে নানা মূর্তি খোদিত। কোথাও বাদকরা বাদ্যযন্ত্র বাজাচ্ছেন, কোথাও সুন্দরী মেয়েরা নাচছেন—সবই জীবন্ত বলে মনে হয়। শুধু মানুষ নয়, পশু-পাখির মূর্তিগুলিও অপরূপ। রথের আকারের মন্দিরটির সামনে যে-কয়টি ঘোড়ার মূর্তি আছে সেগুলি এবং একটি হাতীর মূর্তি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পের নমুনা। দুঃখের বিষয় এ-মন্দিরটি সম্পূর্ণ আকারে আমরা পাইনি। এর পর মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে তাজমহল প্রভৃতি শিল্পের নিদর্শনের কথা তোমরা পরে পড়বে।

কোনারকের রথের চাকা

পরিচারক সহ ঘোড়া

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হর্ষবর্ধন

প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজারা শুধুমাত্র রাজ্যজয় করেননি। প্রজাপালন শিল্পসাহিত্য প্রসার, বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন, ধর্ম ও সমাজের উন্নতিসাধন ইত্যাদিকে তাঁরা রাজার অবশ্য-কর্তব্য বলে মনে করতেন। হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির—এঁরা আমাদের আদর্শ রাজা। হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির সত্যি-সত্যি ছিলেন কিনা জানা যায়নি। সম্রাট অশোকের কথা আমরা জানি। অশোকই পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট যিনি একটি যুদ্ধ জয় করে, যুদ্ধের মারামারি কাটাকাটি দেখে দুঃখিত হয়ে যুদ্ধ ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাকি জীবন তিনি শুধু দেশ এবং বিদেশের লোকেদের উপকারের জন্য নানা ব্যবস্থা

হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
হিউ য়েন সাঙের পরিক্রমা
গান্ধার
কাশ্মীর
পুরুষপুর
তক্ষশীলা
মুলতান
থানেশ্বর
শ্রাবস্তী
কাটমণ্ডু
কপিলাবস্তু
আলোয়ার
কনৌজ
গুর্জর
কুশীনগর
কাশী
প্রয়াগ
পাটলিপুত্র
বুদ্ধগয়া
গয়া
উজ্জয়িনী
সুরাষ্ট্র
ধারা
তাম্রলিপ্ত
বাকাটক
চালুক্য
কলিঙ্গ
বঙ্গোপসাগর
কল্যাণ
আরবসাগর
বাতাপী
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
মাদুরা
সিংহল
ভারত মহাসাগর

শশাঙ্কের সিল মোহর
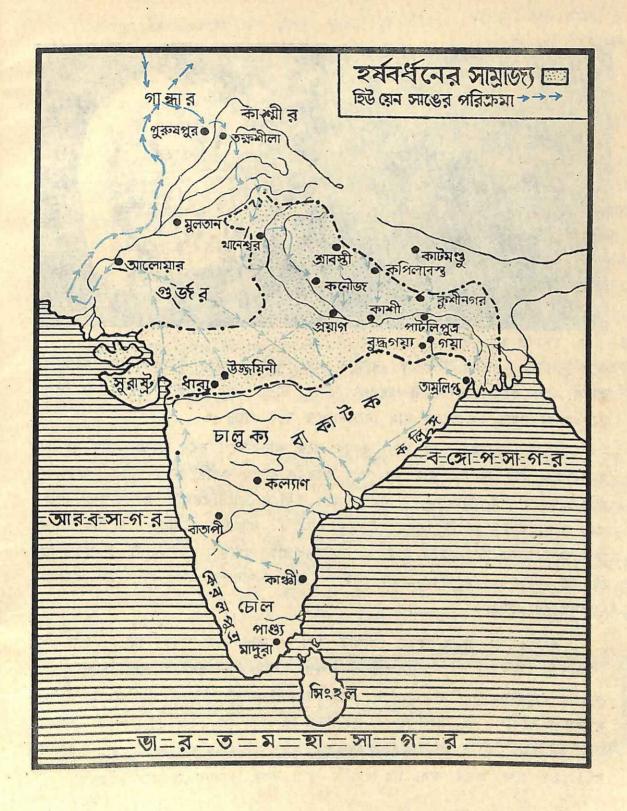
করেছিলেন। গল্পের হরিশ্চন্দ্র, রামচন্দ্র এবং যুধিষ্ঠির এবং সত্যিকারের অশোকের আদর্শ মনে করে ভারতবর্ষের অনেক রাজা নানা রকম সৎকাজ করে গিয়েছেন। তার মধ্যে সম্রাট হর্ষবর্ধনের নাম বিশেষভাবে মনে পড়ে।

খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বৎসর পরে, আরবদেশে যখন মহম্মদ তাঁর ধর্মপ্রচার করছিলেন, ঠিক তখনই আমাদের দেশে হর্ষবর্ধন রাজত্ব করছিলেন। তখন ভারতবর্ষে মাত্র একটি রাজ্যই ছিল না, অনেক রাজার অধীনে ছোটো-ছোটো অনেক রাজ্য ছিল। তার মধ্যে অন্তত চারটি ছিল বেশ বড়ো রাজ্য। বর্তমান বাংলাদেশ ও আশেপাশের কিছু অংশ নিয়ে ছিল গৌড় রাজ্য। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক। রাজধানী কর্ণসুবর্ণ নামে বিখ্যাত নগরে। কর্ণসুবর্ণ এখন নেই। তার ভগ্নাবশেষ আছে মুর্শিদাবাদ জেলায়—বহরমপুরের কাছে।

কান্যকুব্জে রাজত্ব করত মৌখরি বংশ। তার রাজা অবন্তীবর্মা। তাঁর পুত্র গ্রহবর্মা। মালওয়া বা মালবে ছিলেন গুপ্ত-রাজারা—মহাসেনগুপ্ত এবং তার পুত্রেরা দেবগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত। আর বর্তমান দিল্লির উত্তরে শ্রীকণ্ঠ রাজ্য, তার রাজধানী স্থানীশ্বর বা থানেশ্বর। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহাপ্রতাপশালী প্রভাকর-বর্ধন। হর্ষবর্ধন তাঁরই পুত্র। হর্ষবর্ধনের বড়ো ভাই রাজ্যবর্ধন এবং ছোটো বোন রাজ্যশ্রী। হর্ষবর্ধনের রাজা হবার কথা নয়। কি করে রাজা হলেন সে-কাহিনী বলছি।

ভারতবর্ষের ধনরত্নের কথা শুনে মাঝে মাঝে ভারতের বাইরের অন্য রাজা বা দস্যুদল আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। গ্রীক রাজা আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণ এবং পুরু-রাজার বীরত্বের কথা তোমরা হয় তো শুনেছ। প্রভাকরবর্ধন যখন রাজা, তখন হূন নামে এক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতি বারবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করছিল। প্রভাকর-বর্ধন অন্য রাজাদের সঙ্গে মিলে তাদের হটিয়ে দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো-কোনো রাজার সঙ্গে তাঁর শত্রুতাও ছিল। তাতে সকলেই দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন।

কান্যকুব্জের রাজা গ্রহবর্মার সঙ্গে প্রভাকরবর্ধনের কন্যা 'রাজ্যশ্রীর' বিয়ে হয়। তার অল্পদিন পরেই হূনরা আবার শ্রীকণ্ঠ রাজ্য আক্রমণ করে। প্রভাকরবর্ধনের তখন বয়স হয়েছে। তাঁর বড়ো ছেলে রাজ্যবর্ধন হূনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলে গেলেন। দ্বিতীয় ছেলে হর্ষবর্ধনের বয়স তখন ষোলোর কাছাকাছি। তিনি বনে শিকারে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ খবর পেলেন পিতা প্রভাকরবর্ধন খুব অসুস্থ। তাড়াতাড়ি রাজধানীতে এসে দেখলেন তাঁর জীবনের আশা নেই। স্বামীর মৃত্যুর আশংকায় হর্ষবর্ধনের মা যশোমতী আগেই জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন করলেন। রাজ্যবর্ধন হূনদের পরাজিত করে ফিরে এসে বাবা-মা কাউকে দেখতে পেলেন না। তাঁর ইচ্ছে ছিল হর্ষবর্ধনকে রাজত্ব দিয়ে তিনিও সন্ন্যাসী হবেন, কিন্তু ছোটো ভাইয়ের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে বসলেন।

মালবরাজ দেবগুপ্ত এবং গৌড়রাজ শশাঙ্কের সঙ্গে বর্ধনরাজাদের শত্রুতা ছিল। উনিশ বছরের রাজা রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসার কিছু পরেই তাঁরা একসঙ্গে কনৌজ রাজ্য আক্রমণ করলেন। যুদ্ধে রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মা মারা গেলেন। তখন রাজ্যশ্রীর বয়স মাত্র তের বৎসর। এই খবর পেয়ে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে অগ্রসর হলেন। কিন্তু শশাঙ্কের কৌশলে তিনিও নিহত হলেন। ষোলো বৎসরের হর্ষবর্ধন তখন শশাঙ্ককে দমন করার প্রতিজ্ঞা করে যুদ্ধে গেলেন। কনৌজ গিয়ে শুনলেন, কিশোরী রাজ্যশ্রী প্রাণত্যাগ করবেন বলে বিন্ধ্যপর্বতের দিকে চলে গিয়েছেন। যুদ্ধের আগে বোনকে

হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর

উদ্ধার করার জন্য তিনি বিন্ধ্যপর্বতের দিকে ছুটলেন। অনেক খুঁজে তিনি রাজ্যশ্রীর দেখা পেলেন। রাজ্যশ্রী তখন একটি চিতা জ্বেলে তার চারদিক প্রদক্ষিণ করছেন। সে-চিতায় তিনি প্রাণ বিসর্জন করবেন। হর্ষবর্ধন তাঁকে অনেক বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

কনৌজে তখন কোনো রাজা নেই। মন্ত্রীরা হর্ষবর্ধনকেই রাজ্যের রাজা হতে অনুরোধ করলেন। হর্ষবর্ধন কিন্তু নিজের দুঃখিনী বোন রাজ্যশ্রীকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে কান্যকুব্জে থেকেই দুটি রাজ্য শাসন করতে লাগলেন। হর্ষবর্ধন নিজেও পণ্ডিত এবং ধার্মিক ছিলেন। রাজ্যশ্রী তাঁরই উৎসাহে ধর্ম ও সাহিত্য-কলা-বিদ্যায় পারদর্শিনী হয়ে উঠলেন। সেজন্য এই হতভাগিনী বাল-বিধবা রানীর নাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হর্ষবর্ধনের উদারতায় ও উৎসাহেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বে কনৌজ এবং শ্রীকণ্ঠ মিলে প্রকৃতপক্ষে একটি রাজ্যেই পরিণত হয়েছিল। তিনি দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে আরও অনেক রাজ্য জয় করলেন। শশাঙ্কের

নালন্দা ধ্বংসাবশেষ
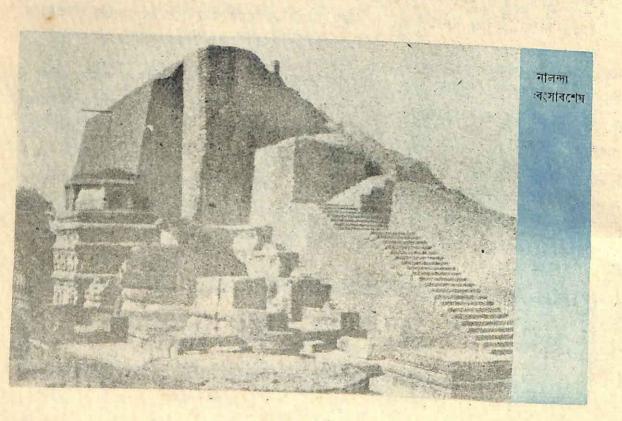
মৃত্যুর পর তিনি গৌড়রাজ্যও জয় করেছিলেন। সমস্ত উত্তর ভারতে তাঁর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু শুধু রাজ্য জয় করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। দেশে যাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে এবং বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের ধর্ম-আচরণে কোনো বাধা না পড়ে, সেদিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তিনি নিজে রাজ্যের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য তাঁর একটি মন্ত্রিসভাও ছিল।

হর্ষবর্ধন রাজত্ব করেন সুদীর্ঘ একচল্লিশ বৎসর। তাঁর রাজত্বের সময় চীন দেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও পরিব্রাজক 'হিউয়েন সাঙ' ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে আমরা তখনকার অনেক কথা জানতে পারি। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য হর্ষবর্ধন নানা রকম ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু অপরাধীকে কঠোর সাজা দেবার ব্যবস্থাও ছিল।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ধর্ম ও সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। হিউয়েন সাঙ চীনদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থানগুলি দর্শন করাও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিছুদিন নানা জায়গায় ঘুরে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। নালন্দা ছিল বর্তমান বিহারের গয়া জেলায়, রাজগীরের কাছে। সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত শীলভদ্র। তিনি সমতটের রাজপুত্র ছিলেন। সমতটের রাজধানী ছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা শহরের কাছে। শীলভদ্রের কাছে হিউয়েন সাঙ বহুদিন অধ্যয়ন করেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ কান্যকুব্জে অবস্থান-কালে হর্ষবর্ধন কনৌজে একটি ধর্মসভা আহ্বান করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী

থেকে এই ধর্মসভার কথা জানা যায়। এ সভায় হর্ষবর্ধনের মিত্র রাজারাও এসেছিলেন। এ সভায় রাজ্যশ্রীও প্রতিদিন উপস্থিত থাকতেন।

কনৌজে ধর্মসভার পর প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় তারপর থেকে প্রতি পাঁচ বছর পর-পর এই মেলা হত। মেলায় হর্ষবর্ধন গরীব-দুঃখীদের দান করতেন। হিউয়েন সাঙ ধর্মসভা থেকে এই মেলায় গিয়েছিলেন। হর্ষবর্ধনের দানের কথা তিনি যে-শ্রদ্ধা নিয়ে বর্ণনা করেছেন, তাতে আমাদের মাথাও হর্ষবর্ধনের পায়ে নত হয়। পাঁচ বছরে তিনি যে অর্থ জমিয়েছিলেন সেগুলি তিনি এ-মেলায় দান করেন। এমন কি ভগিনী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একটি সামান্য বস্ত্র নিয়ে সেটি পরে তিনি নিজের পরনের পরিচ্ছদখানিও গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

হর্ষবর্ধন যে শুধু শিল্প ও সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন, তা নয়। তিনি নিজেও সাহিত্য রচনা করেছেন। 'নাগানন্দ' 'রত্নাবলী' এবং 'প্রিয়দর্শিকা'—এই তিনখানি সংস্কৃত নাটক তিনি লিখেছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন কালিদাস ছিলেন, তেমনি হর্ষবর্ধনের সভায় 'বাণভট্ট' নামে একজন কবি ছিলেন। তাঁর রচিত 'হর্ষচরিত' গ্রন্থটি থেকেই আমরা হর্ষবর্ধন এবং রাজ্যশ্রীর অনেক কাহিনী জানতে পারি। বাণভট্টের রচিত 'কাদম্বরী' সংস্কৃত সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

হর্ষবর্ধন অনেক রাজ্য জয় করে 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। প্রায় একচল্লিশ বৎসর রাজত্ব এবং প্রজাপালন করার পর হর্ষবর্ধন-শিলাদিত্যের মৃত্যু হয় কিন্তু তাঁর কীর্তি অমর।

ধর্মপাল

হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ভারতে আর তেমন পরাক্রমশালী রাজা না থাকায় কিছুদিন ছোটোছোটো রাজাদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ চলতে লাগল। কনৌজের সিংহাসন দখলের জন্য রেষারেষি ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ কনৌজের রাজাকেই তখন উত্তর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে মনে করা হত। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়দেশেও এরকম অবস্থা চলছিল। সবল লোকেরা দুর্বলদের পীড়ন করতে লাগল। জোর যার মুল্লুক তার, —এই নীতিই তখন প্রধান হয়ে উঠল। দুষ্টের দমন করার মতো কেউ আর রইল না।

কিছুদিন এরকম অবস্থা চলার পর বাংলার কিছু বুদ্ধিমান এবং বিবেচক লোক মিলে ঠিক করল, যেমন করেই হোক এ-অরাজকতা দূর করতে হবে। স্থির হল সকলে মিলে একমত হয়ে নিজেদের মধ্য থেকেই একজন উপযুক্ত লোককে রাজা বলে স্বীকার করে নেবেন।

গোপাল' নামে একজনকে অবশেষে নির্বাচন করা হল। সকলের অনুরোধে তিনি সিংহাসনে বসতে রাজি হলেন। তাঁর বংশধরদের প্রত্যেকের নামের শেষাংশ পাল। তাই এই রাজবংশকে বলা হয় পাল-বংশ।

রাজা হবার পর অল্পদিনের মধ্যেই গোপাল দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। তারপর তিনি রাজ্য-জয়ের দিকে মন দিলেন। গোপালের রাজ্য বাংলার সীমা পেরিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত বেড়ে গেল।

পালযুগের ভাস্কর্য

গোপালের পর রাজা হলেন তাঁর পুত্র ধর্মপাল। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র। তখন গোপালের সুশাসনের ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। প্রজাদের অবস্থাও স্বচ্ছল। রাজকোষে প্রচুর অর্থ। ধর্মপাল ঠিক করলেন, রাজ্য জয় করে নিজের রাজ্যের সীমানা বাড়াতে হবে। আর কনৌজ দখল করতে পারলে ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজারাও তাঁকে সম্রাট বলে মান্য করবে।

কনৌজ শহরটি শুধু যে শিক্ষার ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল তা নয়, ব্যাবসা-বাণিজ্যেরও বড় একটি ঘাঁটি ছিল। কিন্তু কনৌজ জয় সহজ হল না। একদিকে প্রতীহারবংশীয় বৎসরাজ ও অপরদিকে রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজা ধ্রুবের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের পরে ধর্মপাল বিজয়ী হয়ে কান্যকুব্জ অধিকার করলেন। তাঁর বীরত্বের খ্যাতি সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়ল।

কনৌজ অধিকার করে ধর্মপাল এক দরবার ডাকলেন। সে-দরবারে উত্তর ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা সবিনয়ে উপস্থিত হয়ে, তাঁর বশ্যতা স্বীকার করলেন। এইরূপে উপস্থিত সকলে ধর্মপালকে সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র সম্রাট বলে মেনে নিলেন। কিছুদিন কনৌজে থেকে তিনি তাঁর শরণাগত রাজা চক্রায়ুধকে সেখানে বসিয়ে, স্বরাজ্যে

পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের স্তূপ
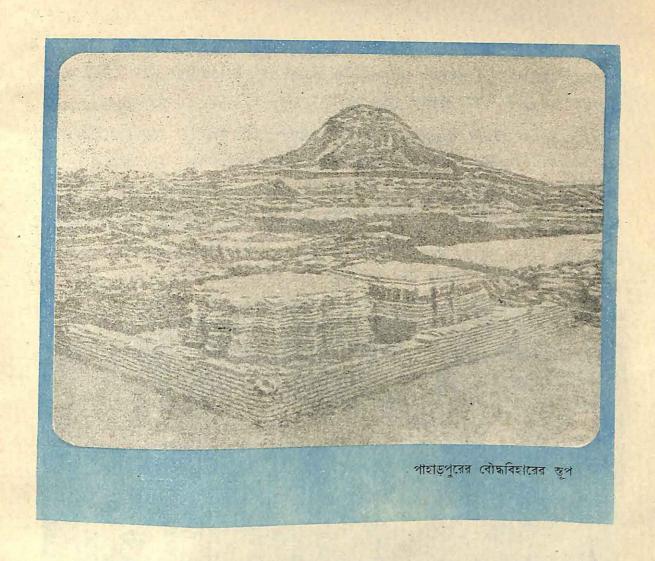
ফিরে এলেন। কিছুদিনের মধ্যেই আবার যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হল। এবার কান্যকুব্জের দিকে হাত বাড়ালেন বৎসরাজের পুত্র নাগভট এবং রাজা বল্লবের পুত্র গোবিন্দ। এবারও জয়পরাজয়ের পরে নাগভট ও গোবিন্দকে হার মানতে হল। ধর্মপাল আবার কনৌজ অধিকার করে একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে বসলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁকে আর কেউ হটাতে পারেনি।

ধর্মপালকে অনেক যুদ্ধ করে রাজ্যজয় ও রাজ্যরক্ষা করতে হয়েছিল। কিন্তু এটাই ধর্মপাল সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা নয়। তিনি একজন সুশাসক সম্রাট ছিলেন, এটাই তাঁর কীর্তির সবচেয়ে বড়ো কথা।

তাঁর রাজ্যে প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খুব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। দেশের লোকেরা শান্তিতে বাস করত। তিনি নিজে বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু অন্য ধর্মের লোকেদের প্রতিও তিনি এক রকম ব্যবহার করতেন।

ধর্মপালের বিবাহ হয়েছিল রাষ্ট্রকূটের এক সামন্তর কন্যার সঙ্গে। তাঁর নাম রন্না দেবী। তিনিও একজন মহীয়সী নারী ছিলেন।

ধর্মপাল বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনুমান করা হয় যে বিক্রমশীলা নামে একটি বৌদ্ধ বিহার তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। বিক্রমশীলা সে-যুগের একটি বিখ্যাত বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল। বহু ছাত্র এখানে থেকে বৌদ্ধধর্ম ও শাস্ত্র সম্বন্ধে লেখাপড়া করতেন।

জাভার বরবুদর মন্দিরের ভাস্কর্য ভারতীয় বণিকদের বাণিজ্যযাত্রা

তার মধ্যে অনেক বিদেশী ছাত্রও ছিলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধ আচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান (অপর নাম অতীশ) এখানে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন। এখান থেকেই তিনি তিব্বতে যান। তিনিই প্রথম ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও জ্ঞানের আলো তিব্বতে নিয়ে যান। দীপংকর বাঙালী ছিলেন। বাংলাদেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে তাঁর বাড়ি ছিল। বিক্রমশীলা সম্ভবত বর্তমান ভাগলপুর জেলায় অবস্থিত ছিল। সে-কালের আরও একটি বিখ্যাত বিহার ছিল 'সোমপুর' বা 'সোমপুরী'। বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে এই বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এই বিহারও ধর্মপালের প্রতিষ্ঠিত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করার পর ধর্মপালের মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র দেবপালও সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি ছিলেন। দেবপালের সময় ভারতবর্ষের সঙ্গে সুমাত্রা দ্বীপের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জানা যায়। তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমান্তের গান্ধার (পেশোয়ার) প্রদেশ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রা দ্বীপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল।

উত্তর-ভারতে প্রায় চারশো বৎসর রাজত্ব করার পর পাল-বংশের পতন ঘটে। এই পাল-রাজাদের রাজত্বকালটাই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে গৌরবের যুগ।

নবম পরিচ্ছেদ

বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন

পাল-রাজাদের পরেই সেন-রাজাদের আবির্ভাব, হয়। সেন-রাজাদের আদিনিবাস দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটদেশে (অর্থাৎ মহীশুর, যার বর্তমান নাম কর্ণাটক) তাঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন কর্ণাটক্ষত্রিয় বলে।

সামন্তসেন নামে সেন-বংশের একজন আদিপুরুষ রাঢ়দেশে অর্থাৎ গঙ্গার পশ্চিম অঞ্চলে বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর পৌত্র বিজয়সেনের সময় সেন-বংশের প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। তাঁর পরাক্রমে ছোটো ছোটো অনেক রাজা তাঁর পদানত হন এবং রাজ্যের আয়তন বেড়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনিই পাল-রাজাদের হাত থেকে বাংলা-দেশের অনেকাংশ অধিকার করেন।

বিজয়সেনের পর তাঁর পুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে বসেন। বল্লালসেনকে অবশ্য খুব বেশি যুদ্ধ-বিগ্রহ করতে হয়নি। তাঁর খ্যাতি বীরত্বের জন্য নয়, তাঁর খ্যাতি শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জ্ঞানচর্চার জন্য। বল্লালসেন সমাজের নানা পুরনো অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানকে বদ্‌লে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বিদ্বানদের সম্মান করতেন। সাহিত্যেও তাঁর অনুরাগ ছিল। নিজেও সংস্কৃতে 'দান সাগর' এবং 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ

কথিত আছে, বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে নিজের পুত্র লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে, স্ত্রীর সঙ্গে স্বেচ্ছায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে প্রাণ বিসর্জন করেন।

বল্লালসেন অনেকদিন রাজত্ব করেছিলেন, কাজেই লক্ষ্মণসেন যখন রাজা হলেন, তখন তাঁর অনেক বয়স। রাজা হবার আগেই পিতামহ বিজয়সেন এবং পিতা বল্লাল-সেনের সঙ্গে থেকে তিনি অনেক যুদ্ধ করেছিলেন। ওড়িষা এবং কামরূপ তিনি জয় করেন। কাশী, প্রয়াগ ও পুরীতে তাঁর জয়স্তম্ভ স্থাপিত হয়েছে। উত্তর বিহারের মিথিলাও তাঁর অধিকারে ছিল বলে মনে হয়।

পিতার মতো লক্ষ্মণসেন নিজেও বিদ্যার চর্চা করতেন এবং জ্ঞানী-গুণীদের উৎসাহ দিতেন। বিক্রমাদিত্যের যেমন নবরত্ন ছিলেন, লক্ষ্মণসেনের সভায়ও তেমনি অনেক রত্ন ছিলেন। 'গীতগোবিন্দ' বলে সংস্কৃতে একটি বিখ্যাত কাব্য আছে। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেব লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ছিলেন। তাছাড়া 'ধোয়ী', 'হলায়ুধ', 'উমাপতিধর', 'শরণ', 'গোবর্ধন' প্রভৃতি আরও অনেক কবি তাঁর সভা

অলংকৃত করেছিলেন। বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সময় বাংলাদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চার খুব উন্নতি হয়েছিল।

মালদহ জেলার গৌড়ের কাছে লক্ষ্মণাবতী বলে একটি শহরের কথা জানা গিয়েছে। বোধ হয় এটিই লক্ষ্মণসেনের রাজধানী ছিল। নবদ্বীপেও তাঁর রাজধানী ছিল বলে প্রমাণ আছে। শেষ জীবন তিনি বিক্রমপুরে কাটিয়েছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের শেষ বয়সে বাংলাদেশে এসে তুর্কীরা তাঁর রাজধানী অধিকার করে নেয়। তারপর তাঁর কথা আর বেশি কিছু জানা যায় না। লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা আরও কিছুকাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

তুর্কীরা মাত্র আঠারো জন অশ্বারোহী নিয়ে বাংলা দেশ জয় করেছিলেন, এমন একটি গল্প প্রচলিত আছে। সে-গল্পকে কোনো ঐতিহাসিক-ই সত্য বলে মনে করেন না। তবে তুর্কী সেনাদলের অতর্কিত আক্রমণে বাংলাদেশের এক অংশে যে সেন-রাজত্বের অবসান হয়, একথা সত্য।

শেষ বয়সে তুর্কীদের আক্রমণে তাঁকে রাজ্যের অনেক অংশ হারাতে হলেও, লক্ষ্মণসেন বাংলাদেশের ইতিহাসে অত্যন্ত উঁচু স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর দানশীলতা এবং জ্ঞানী-গুণীদের সম্মান করার কাহিনী আজও লোকে মনে করে। যে-প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিকের গ্রন্থ থেকে লক্ষ্মণসেনের বিবরণ জানা যায়, তিনিও বলেছেন 'রায় লখ্‌মনিয়ার' (রাজা লক্ষ্মণসেনের) মতো দাতা সচরাচর দেখা যায় না।

লক্ষ্মণসেনের পরেই উত্তর-ভারতের প্রায় সব জায়গায় প্রাচীন যুগের অবসান হয়। তারপর মধ্যযুগ সুরু হয় তুর্কীদের প্রাধান্যলাভের সঙ্গে।

দশম পরিচ্ছেদ

হুসেন শাহ ও চৈতন্যদেব

আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে আমাদের এই বাংলাদেশে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অশোক এবং আকবরের সঙ্গে তুলনা করলে তিনি নিতান্তই ছোটো রাজা। বাংলাদেশ এবং তার বাইরে অল্প কিছু জায়গা মাত্র তাঁর অধিকারে ছিল। অশোক এবং আকবরের মতো এত বড়-বড় কীর্তিও তিনি রেখে যাননি। তবু তাঁর ছোটো রাজ্যের মধ্যে নিজের সাধ্যমতো প্রজাদের মঙ্গলের চেষ্টা করেছিলেন বলে, আজও আমরা তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রেখেছি। তাঁর নাম হুসেন শাহ।

প্রায় আটশো বছর আগে তুর্কীরা বাংলাদেশ জয় করে। তারা এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেও চায়নি। তাদের উদ্দেশ্য ছিল এ-দেশের ধনরত্ন নানাভাবে অধিকার করা। এর জন্য তারা বাঙালীদের উপর অত্যাচারও করেছিল। কিন্তু আস্তে-আস্তে দুপক্ষেরই মনের ভাব-পরিবর্তন হল। তুর্কি রাজারা এদেশেই থেকে গেলেন এবং যথাসম্ভব এদেশের লোকের মঙ্গলের দিকে নজর দিলেন। ক্রমে দেশের লোকেরাও রাজা বলে এঁদের মেনে নিলেন। তুর্কীরা মুসলমান ধর্মীয় ছিলেন। এভাবেই এদেশে মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত হল। দেশ থেকে অত্যাচার-অবিচার দূর করে যেসব মুসলমান রাজারা বাংলাদেশকেই নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন, হুসেন শাহের নাম তাদের মধ্যে সবার উপরে।

হুসেন শাহ গরিবের ছেলে ছিলেন। কিন্তু নিজের বুদ্ধি ও পরিশ্রমের ফলে তিনি ধীরে-ধীরে দেশের মন্ত্রী হয়ে উঠলেন। পূর্বাংশ ছাড়া সমস্ত বাংলা দেশকে তখন 'গৌড়' বলা হত। পূর্বাংশকে বলা হত 'বঙ্গ'। গৌড়-বঙ্গের অধিকাংশই তুর্কী রাজার অধীনে। তখন এই রাজ্যের রাজার নাম ছিল মজঃফর শাহ। হুশেন শাহ তাঁরই মন্ত্রী। মজঃফর শাহ অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। পাছে অন্য কেউ তাঁর সিংহাসন কেড়ে নেয়, এই ভয়ে রাজা হয়েই তিনি বহু ক্ষমতাশালী লোককে মেরে ফেলেন। খাজনা আদায় করার জন্য তিনি প্রজাদের উপর অকথ্য অত্যাচারও করতেন। অত্যাচার যখন চরমে উঠল তখন হুসেন শাহ অপর কয়েকজনের সহায়তায় মজঃফর শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা হয়েই হুসেন শাহ দেশে শান্তি এবং শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা এলে তিনি রাজ্য-বিস্তারে মন দিলেন। পশ্চিম-দিকে ওড়িষা এবং বিহারের কিছু অংশ তাঁর অধিকারে আসে। পূর্বদিকে আসামের কামরূপ ও কামতা রাজ্য এবং ত্রিপুরার কিছু অংশও তিনি জয় করে নেন। কিন্তু তাঁর সুনামের আসল কারণ হল তিনি ছিলেন একজন দক্ষ ও বিচক্ষণ সুশাসক। প্রজাদের সুখ-সুবিধার জন্য তিনি অনেক সৎকাজ করেছিলেন। বিদ্বানরা এবং পণ্ডিতেরা যাতে নির্বিবাদে লেখাপড়া করতে পারে, তার জন্য তিনি বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। হুসেন শাহ নিজে মুসলমান হলেও অন্য ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর সময়ে চৈতন্যদেব ধর্ম-প্রচার করেন। তাঁর শাসনগুণে সেকাজে কোনো প্রবল বাধা দেখা দেয়নি।

তাঁর রাজকার্যে হিন্দুরা বড়ো বড়ো পদ পেতেন। পণ্ডিত 'সনাতন' এবং সুকবি 'রূপ' নামে দুই ভাই তাঁর রাজসভায় কাজ করতেন। পরে তাঁরা দুজনেই চৈতন্য-দেবের শিষ্য হয়ে যান। তাঁর উজীর বা মন্ত্রী ছিলেন পুরন্দর খাঁ, তাঁর শরীর-রক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন কেশব ছত্রী। এঁরা সবাই হিন্দু।

হুসেন শাহের আমলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। সেসময়ের বড়ো বড়ো বাঙালী কবিরা আগ্রহের সহিত হুসেন শাহের নাম উল্লেখ করেছেন। বরিশালের কবি বিজয়গুপ্ত লিখেছেন, 'সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি-তিলক।'

চট্টগ্রামে হুসেন শাহের প্রতিনিধি ছিলেন পরাগল খাঁ ও তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ। এঁদের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকরণ নন্দী নামে দুজন কবি বাংলা মহাভারত লিখেছিলেন।

ছাব্বিশ বৎসর দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করার পর হুসেন শাহের মৃত্যু হয়। তাঁর রাজত্বকালে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকায়, নানাভাবে দেশের উন্নতি হয়। এইজন্য হুসেন শাহের আমলকে বাংলাদেশের একটি গৌরবের যুগ বলে মনে করা হয়। হুসেন শাহের রাজত্বকালের সবচেয়ে বড়ো ঘটনা চৈতন্যদেবের ধর্মপ্রচার। এবার তাঁর কথাই তোমাদের বলব।

চৈতন্যদেব বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষের অসাধারণ মহাপুরুষদের একজন। তিনি আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ তার কিছুকাল আগে বাংলাদেশের রাজধানী ছিল। তখন বিদ্বান পণ্ডিতদের বাসস্থান হিসেবে নবদ্বীপের বিশেষ খ্যাতি ছিল। চৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁর স্ত্রীর নাম শচীদেবী। দেশের নানা স্থান থেকে টোল বা চতুষ্পাঠীতে পড়তে বা পড়াতে তখন অনেক পণ্ডিতই নবদ্বীপে এসে জড়ো হতেন। কিন্তু দেশের সামাজিক অবস্থা তখন ভালো ছিল না। ধর্মের নামে নানারকম কুৎসিৎ আচার-অনুষ্ঠানের তখন বড়ো বাড়াবাড়ি হয়েছিল। গঙ্গার তীরে অবস্থিত বলে নবদ্বীপ একটি তীর্থস্থান। সকালবেলা গঙ্গার ঘাট জমজমাট হয়ে থাকত। কেউবা জলে নেমে পূজা-অর্চনা করছে; কেউ তীরে বসে শাস্ত্র-আলোচনা বা ধর্মসংগীত গাইছে; কেউবা আবার শুধু আনন্দের জন্যই গঙ্গায় সাঁতার কাটছে। মাঝেমাঝে সমুদ্রগামী বড়ো-বড়ো নৌকো এসে তীরে ভিড়ছে। পূজার দিন বা অন্য কোনো উৎসবের দিনে সমস্ত নগরের লোক গঙ্গার ঘাটে এসে ভেঙে পড়ত।

এমনি এক পুণ্যদিনে, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দে দোলপূর্ণিমার রাত্রিতে, চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। চৈতন্যের জন্মের আগে তাঁর বড় ভাই মারা যান। তাঁর আর এক বড় ভাই বিশ্বরূপ অল্প বয়সে সন্ন্যাসী হয়ে যান। চৈতন্যদেবের নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আর ঘরোয়া নাম ছিল নিমাই। সবাই তাঁকে এ নামেই ডাকত।

নিমাই অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে, সকলেই বিশ্বাস করতেন যে তিনি একজন মহাপুরুষ হবেন। নিমাই কিন্তু ছেলেবয়স থেকে অত্যন্ত দুর্দান্ত ছিলেন। পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে দল পাকিয়ে তিনি সমস্ত নবদ্বীপের লোককে অস্থির করে তুলতেন। নবদ্বীপের ঘাটে যাঁরা স্নান করতে যেতেন, তাঁদের ডাঙায়-রাখা কাপড়-চোপড় নিমাই উলটোপালটা করে দিতেন; কখনও বা জল ছিটিয়ে পুরোহিতদের
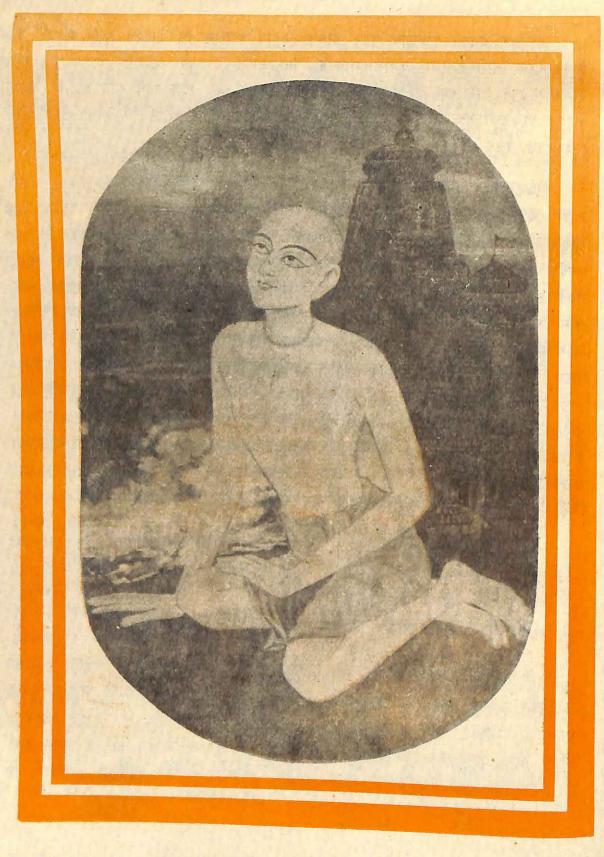
পুজো পণ্ড করে দিতেন; কখনও ডুব-সাঁতার কেটে কোনো স্নানার্থীর পা ধরে টেনে তাকে গভীর জলে নিয়ে যেতেন। এদিকে আবার পড়াশুনায় তাঁর আশ্চর্য মেধা ছিল। গঙ্গাদাস নামে একজন পণ্ডিতের টোলে নিমাই ভর্তি হলেন। দুরন্তপনা কমল না। কিন্তু টোলের তিনি হলেন সেরা ছাত্র। অল্প বয়সেই পণ্ডিত বলে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। কিছুকাল পরে তিনি নিজেই টোল খুলে ছাত্রদের পড়াতে লাগলেন। গুরু হিসেবেও তাঁর খুব নাম-ডাক হল। দূরদূরান্ত থেকে ছাত্রেরা তাঁর কাছে পড়তে আসতে লাগল। নিমাই পণ্ডিতের দাদা বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর পিতামাতা তাঁকে অল্প বয়সেই বিবাহ দিয়ে দেন। একবার চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গে গিয়েছেন। ফিরে এসে শুনলেন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীদেবী সর্পাঘাতে মারা গিয়েছেন। দু'বছর পরে তাঁর আবার বিয়ে হল। স্ত্রীর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া। কিন্তু নিমাই কেমন যেন উদাস হয়ে থাকতেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধ করতে গয়ায় গিয়ে নিমাই একেবারে অন্যমানুষ হয়ে এলেন। মুখে সারাক্ষণ হরিনাম, চোখে আনন্দাশ্রু। পাণ্ডিত্যের পথ ছেড়ে তিনি এবার ভক্তির পথ বেছে নিলেন। নবদ্বীপের বহু লোক তাঁর শিষ্য হল। রাস্তায়-রাস্তায় ভক্তদের নিয়ে তিনি নাম-কীর্তন করে বেড়াতেন। সেখানকার এক বিখ্যাত সাধু ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তিনি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। মা শচীদেবী, স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া এবং টোলের ছাত্ররা পিছনে পড়ে রইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণ করে কিছুদিন নানা জায়গা ঘুরে চৈতন্যদেব নবদ্বীপে এসে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। তাঁর কাছে জাতের বিচার ছিল না। ব্রাহ্মণ থেকে চণ্ডাল—সকলেই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সমান হয়ে গেল। তাঁর মুসলমান শিষ্যও ছিল। তাঁদের মধ্যে যবন হরিদাসের নাম বিশেষ খ্যাত। হুসেন শাহের দু'জন পারিষদ রূপ এবং সনাতন নামে দুই ভাই তাঁর শিষ্য হয়ে রাজকার্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিছুদিন বাংলা-দেশে ধর্মপ্রচার করে তিনি ওড়িষার পুরীতে চলে যান। সেখানে জগন্নাথদেবের মন্দিরেই তিনি থাকতেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে তাঁর নাম হয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। সেজন্য তিনি চৈতন্যদেব নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর দেহ ছিল গৌরবর্ণ অর্থাৎ ফরসা; সেজন্য তিনি 'গৌরাঙ্গ' বা 'গৌরচন্দ্র' নামেও পরিচিত হন। পুরীর জগন্নাথ-মন্দিরের আর এক নাম 'গৌরবাটি'। ওড়িষা বাসকালে তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে যান।

যেখানেই গিয়েছেন সেখানেই অগণিত লোক তাঁর শিষ্য হয়েছেন। আনুমানিক আটচল্লিশ বছর বয়সে পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর তাঁর প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের আরও প্রসার হয়। তাঁর শিষ্যেরা পুরী, বৃন্দাবন প্রভৃতি জায়গা থেকে কথা এবং উপদেশ প্রচার করতে থাকেন। এই ধর্মকে অবলম্বন করে আমাদের দেশের সমাজ এবং সাহিত্যেরও নানা প্রকার উন্নতি হয়। সেজন্য চৈতন্যদেবকে ভারতবর্ষের একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে আজও আমরা পূজা করি।

ছত্রপতি শিবাজী

ভারতবর্ষে বারবার বিদেশী আক্রমণ হয়েছে। এই বিদেশীরা ভারতবর্ষের কোনো-কোনো অংশ দখল করে রাজা হয়ে বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এদেশেই থেকে গেলেন, এদেশকেই নিজেদের দেশ বলে মেনে নিলেন। এভাবে তাঁরাও ভারতবাসী হয়ে গেলেন। তুর্কীরা একসময় উত্তর-ভারতবর্ষের প্রায় সবটাই দখল করে নেয়। তারপরে এল পাঠান এবং মোগলরা। তাঁরা সকলেই ধর্মে মুসলমান। তাই তাঁদের রাজত্বের সময়টাকে বলা হয় মুসলমানী আমল। এইসব রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন সম্রাট আকবর। তিনি হিন্দু-মুসলমান বা অন্য ধর্মের মধ্যে প্রভেদ না করে সমস্ত প্রজাদের উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টা করতেন।

কিন্তু তাঁর বংশধরেরা অনেকে তাঁর পথে চলেননি। সেজন্য জায়গায়-জায়গায় তাঁদের বিরুদ্ধে কেউ-কেউ যুদ্ধ করেছিলেন। শিবাজী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। সে সময়ে হিন্দু ও মুসলমান রাজারা সকলেই সকলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেন। হিন্দুরাও মুসলমানের পক্ষে থাকতেন।

শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে মহারাষ্ট্রের এক মুসলমান সুলতানের জায়গীরদার ছিলেন। তিনি ওই সুলতানের পক্ষ হয়ে দিল্লির সম্রাট শাহজাহানের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে সুলতানের পরাজয় হলে তিনি পাশের রাজ্যের সুলতানের কাছে কাজ নিয়ে চলে যান। কিন্তু পত্নী জীজাবাঈ এবং পুত্র শিবাজীকে দাদাজী কণ্ডদেব নামে একজন বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে রেখে যান। তাঁরা থাকতেন পুণা গ্রামে; পুণা তখনও শহর হয়নি।
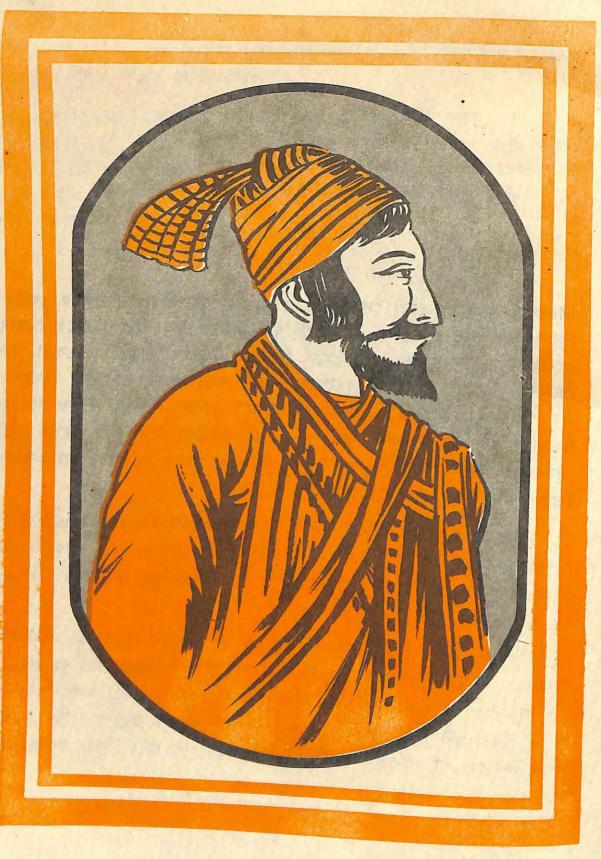
শিবাজী ছেলেবেলায় লেখাপড়া বিশেষ কিছু শেখেননি। তবে দাদাজী এবং নিজের মায়ের কাছে মুখে-মুখে রামায়ণ-মহাভারত এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের কাহিনী শুনতে ভালোবাসতেন। কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল। অল্প বয়সেই তিনি 'মাওয়ালী' নামক এক পার্বত্যজাতির কিছু অনুচর নিয়ে পাহাড়-পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। এই দলকে নিয়েই তিনি একসময়ে বিজাপুরের একটি দুর্গ দখল করে ফেলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র উনিশ।

কিছুদিন পরে দাদাজী কণ্ডদেবের মৃত্যু হল। শিবাজী এবার স্বাধীনভাবে কাজ করতে লাগলেন। অনেকগুলি দুর্গ আস্তে আস্তে তাঁর দখলে এল। এ ভাবেই তিনি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করে ফেললেন। তখন দিল্লির সিংহাসনে ছিলেন আকবরের নাতি সম্রাট শাহজাহান। মোগলরাজ্যের সীমায় মহারাষ্ট্রের যেসব জায়গা ছিল, শিবাজী সেগুলিও দখল করার মতলব করলেন। শাহজাহানের পুত্র আওরঙ্গজেব তখন দক্ষিণ ভারতে মোগল সম্রাটের সুবাদার। তিনি ভাবলেন, শিবাজীকে শায়েস্তা

শিবাজীর সংকেত পেয়ে তাঁর সৈন্যদল বেরিয়ে আসে

শিবাজী মায়ের কাছে ... প্রাচীন গ্রন্থের কাহিনী শুনতে ভালোবাসতেন
কিন্তু যুদ্ধ-বিদ্যায়ও তাঁর খুব আগ্রহ ছিল

করবেন। এর মধ্যে হঠাৎ পিতার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে তাঁকে দিল্লি চলে আসতে হল। এবার শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্য বাড়িয়ে নেবার এক মহা সুযোগ এসে গেল। এদিকে বিজাপুরের সুলতান, আফজল খাঁ নামে একজন সেনাপতিকে শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠালেন। কারণ শিবাজী বিজাপুরের দুর্গগুলি কেড়ে নিয়েই স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। আফজল খাঁ নানা কৌশলে শিবাজীকে তাঁর এক দুর্গের বাইরে আনবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শিবাজী তাঁর ফাঁদে ধরা দিলেন না। শেষে আফজল সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। ঠিক হল দুজনেই অস্ত্র না নিয়ে শুধু দুজন অনুচরের সঙ্গে এক জায়গায় দেখা করে সন্ধির কথা আলোচনা করবেন। কিন্তু যখন দেখা হল আফজল শিবাজীর সঙ্গে কোলাকুলি করার সময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেন। শিবাজীও কম যান না। তিনি জামার তলায় শক্ত লোহার বর্ম পরেই এসেছিলেন। বাঁ হাতে পরা ছিল 'বাঘনখ' নামে ছুঁচলো অস্ত্র। আর ডান হাতের আস্তিনের তলায় ছিল 'বিছুয়া' নামে ছোট একটি ছোরা। আফজলের ছোরা লোহার বর্মে লেগে ফিরে আসতেই, শিবাজী বাঘনখ দিয়ে তাঁর পেট চিরে ফেললেন আর ছোরাটিও তাঁর বুকে বসিয়ে দিলেন। আফজলের এক অনুচর শিবাজীর মাথায় তলোয়ারের কোপ মারল। পাগড়ি কেটে দুখান হল, কিন্তু পাগড়ির তলায় ছিল লোহার টুপি। শিবাজীর সংকেত পেয়ে তাঁর সৈন্যদল বেরিয়ে এসে আফজলের সেনাদলকে পুরোপুরি হারিয়ে দিল।

যুদ্ধ কিন্তু শেষ হল না। বিজাপুরের সুলতান নূতন সৈন্য পাঠালেন। ওদিকে দিল্লিতে ঔরঙ্গজেব সম্রাট হয়ে তাঁর মামা শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন, শিবাজীকে দমন করতে। শায়েস্তা খাঁ বীর এবং শাসনের কাজেও নিপুণ। তিনি শিবাজীর কয়েকটি দুর্গ এবং পুণা গ্রাম দখল করে নিলেন। শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর ছেলেবেলার বাড়িতে জাঁকিয়ে বসলেন। শিবাজী কিন্তু একদিন রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে কয়েকজন অনুচর নিয়ে সে-বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। বাড়ির সব অলিগলি শিবাজীর চেনা। শায়েস্তা খাঁর শোবার ঘরে ঢুকে তিনি তাঁকে আক্রমণ করলেন। একটি বুদ্ধিমতী দাসী তক্ষুণি আলো নিবিয়ে দেওয়াতে, শায়েস্তা খাঁ প্রাণ নিয়ে পালাতে পারলেন। কিন্তু শিবাজীর তলোয়ারের আঘাতে তাঁর একটি আঙুল কাটা গেল। এই ঘটনার পর ঔরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বাংলাদেশে সরিয়ে নিয়ে এলেন।

শিবাজীর প্রতিপত্তি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে দেখে, ঔরঙ্গজেব তাঁর বিখ্যাত সেনাপতি জয়সিংহকে শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠালেন। জয়সিংহ শিবাজীকে পরাজিত করে, বারোটি দুর্গ বাদে আর পুরো রাজ্যই তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিলেন। শুধু তাই নয়, শিবাজীকে দাক্ষিণাত্য থেকে সরিয়ে দেবার ফন্দিতে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে, নানা মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে, ঔরঙ্গজেবের রাজধানী আগ্রায় যেতে রাজি করালেন। শিবাজী তাঁর ছেলে শম্ভুজী এবং কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে আগ্রায় গেলেন। কিন্তু রাজসভায় তাঁকে অপমান করা হল। দরবারে যেসব নিয়ম পালন করতে হয় সেগুলি তিনিও পালন করলেন না। ঔরঙ্গজেব রেগে তাঁকে নিজের বাড়িতেই বন্দী করে রাখলেন।

অন্য কেউ হলে এ অবস্থায় অত্যন্ত মুষড়ে পড়তেন। কিন্তু শিবাজী নিরাশ হবার লোক ছিলেন না। তিনি ভেবে-চিন্তে এক বুদ্ধি বার করলেন। কিছুদিন পরে রটিয়ে দিলেন যে, তাঁর খুব অসুখ করেছে, বিছানায় শুয়ে আছেন। তারপর অসুখ সেরে গেছে বলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও সভাসদ্‌দের প্রত্যেক দিন বড়ো বড়ো ঝুড়ি করে ফল, মিষ্টি ইত্যাদি পাঠাতে লাগলেন। প্রথমে প্রহরীরা ঝুড়িগুলি পরীক্ষা করে দেখত। কিন্তু ক্রমে পরীক্ষা করা ছেড়ে দিল। এই সুযোগে শিবাজী এবং শম্ভুজী দুটি ঝুড়িতে বসে উপরে অন্য কিছু চাপা দিয়ে মুটের মাথায় চড়ে বাড়ির বাইরে চলে এলেন। তারপর সন্ন্যাসীর বেশে অন্য অনেক দেশ ঘুরে নিজের রাজধানী রায়গড়ে এসে পোঁছলেন।

নর্মদা
তাপ্তী
সুরাট
ধরমপুর
দমন
চান্দর
দৌলতাবাদ
ঔরঙ্গাবাদ
নাসিক
বোম্বাই
কল্যাণ
গোদাবরী
আহম্মদনগর
পুণা
জাঞ্জিরা
সাতারা
গোলকুণ্ডা
রায়গড়
ভীমা
বিজাপুর
কোলাপুর
কৃষ্ণা
তুঙ্গভদ্রা
গোয়া
বেলারী
কারোয়ার
সিরা
আর্কট
বাঙ্গালোর
ভেলোর
জিঞ্জি
কাবেরী
ত্রিচিনপল্লী
তাঞ্জোর
মাদুরা
শিবাজীর রাজ্য
শিবাজীর রাজ্য
মাইল
০ ১০০ ২০০
সিংহল
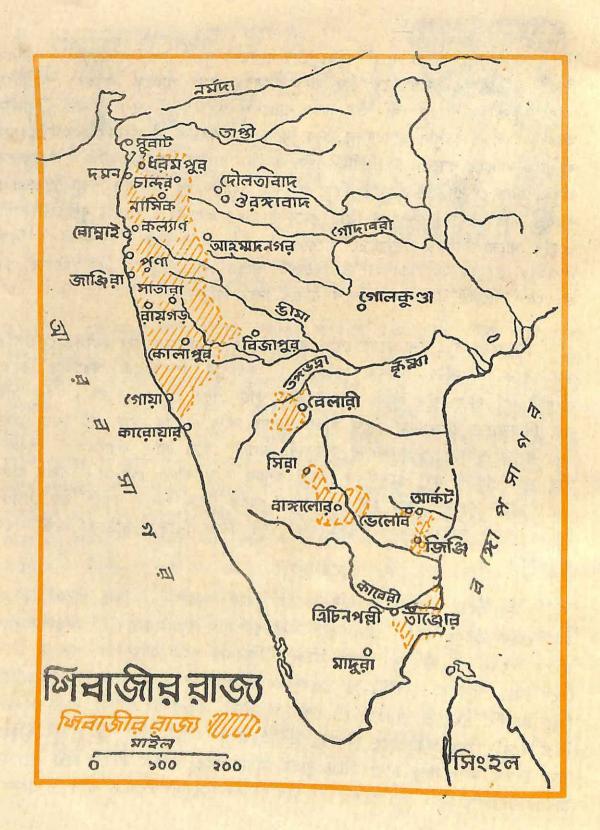
সন্ধি অনুযায়ী শিবাজী আগ্রায় উপস্থিত হলেন

আগ্রা থেকে রায়গড়ের রাস্তায়-রাস্তায় ঔরঙ্গজেবের প্রহরীরা তাঁকে খুঁজে বেড়াল, কিন্তু তাঁকে ধরতে পারল না। শিবাজী পৌঁছে দেখলেন শম্ভুজী তখনও আসেননি। তাঁকে অন্য পথ দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি রটিয়ে দিলেন, শম্ভুজী পথেই মারা গিয়েছেন। ঔরঙ্গজেবের সৈনিকরা তাঁকে খোঁজা ছেড়ে দিল। কিছুদিন পর শম্ভুজীও এসে রায়গড়ে পৌঁছলেন। ঔরঙ্গজেব দেখলেন, শিবাজীকে দমিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পরে তিনি তাঁকে রাজা উপাধি দিয়ে স্বীকার করে নিলেন।

কিন্তু শিবাজী মোগল সম্রাটের অধীনে থাকবার পাত্র নন। তিনি জানতেন, সম্রাট উত্তর ভারতে নানা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছেন। আস্তে-আস্তে সেই সুযোগে মহারাষ্ট্রের অন্যান্য অংশ দখল করে তিনি স্বাধীন রাজা হয়ে বসলেন। তাঁর উপাধি হল 'ছত্রপতি'। রাজধানী হল রায়গড়।

এরপর শিবাজী মাত্র ছয় বৎসর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই ছয় বৎসরেই রাজ্যের নিয়মকানুন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর রাজ্যশাসনের রীতি, খাজনা আদায়ের নিয়ম ইত্যাদি এখন পর্যন্ত সকলের প্রশংসা লাভ করছে।

শিবাজীর গুরু ছিলেন সন্ন্যাসী রামদাস স্বামী। কিন্তু শেখ মুহম্মদ নামে একজন মুসলমান সাধককেও তিনি খুব শ্রদ্ধা করতেন। নিজে হিন্দু হলেও তিনি সকল ধর্মের লোকেদের সঙ্গে উদার ব্যবহার করতেন। মুসলমানদের ধর্মস্থানে আলো দেবার জন্য তিনি বহু নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। যুদ্ধের সময় যাতে মসজিদ বা কোরাণের কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য তিনি তাঁর অনুচরদের কড়া হুকুম দিয়েছিলেন। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরাণ তাঁর হাতে পড়লে, তিনি সেটি তাঁর কোনো মুসলমান অনুচরকে দান করতেন। মেয়েদের প্রতি যাতে কোনো অত্যাচার না হয় সেদিকেও তাঁর নজর ছিল। এজন্য এখনকার মুসলমান ঐতিহাসিকও তাঁর বিশেষ প্রশংসা করেছেন।

এইসব কারণে ভারতবর্ষের একজন বীর সন্তান ও মহৎ রাজা হিসাবে, আজও সকলেই শিবাজীকে অশোক ও আকবরের মতোই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।